LIKHON 2019 Puja Magazine

Stockholm Sarbojonin Puja Committee

লিখন

শারদীয় পত্রিকা

সপ্তম সংখ্যা ১৪২৬ বং

acknowledgements

THANK YOU

Anurupa Nagchowdhury
Jaita B Chakraborty
Arunima Banerjee
Rhituparna Dutta
Indranil Sinha
Apurba Dev
Priya Ranjan Bhakat
Sanjib Das

Dhrubaditya Mitra

Front Cover by

Sreya Saha

(She is a practicing designer and educator, explorer, traveller and most importantly an artist first.)

Likhon Designed by

Sayan Dutta

(He is a short-film maker, passionate photographer, writer, designer and also an Engineer)

Editors

Joydeep Banerjee Ayon Chakraborty

LIKHON is a yearly puja magazine of Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC), Sweden. It's distributed free by SSPC. The writing and artwork herein were produced for SSPC LIKHON. The opinions in the articles are entirely the thoughts and views of the respective authors only and not that of SSPC. No copyright infringement is intended in Likhon 2019

COPYRIGHT © 2019; STOCKHOLMPUJA.COM

या देवी सर्वभुतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

*// Painter and artist Subhadeep Dasgupta has gifted this fantastic painting to **Stockholm Sarbojonin Puja Committee** for this year's **Likhon**. He is based in Stockholm, Sweden and is an IT professional. //*

সূচীপত্র Content

BENGALI LITERACY WORKS

সংবাদমাধ্যমে SSPC ৩
বাংলা মায়ের আগমনের আদিকথা (শ্রী বিষ্ণু চক্রবর্তী)..... ৪
শারদীয় মহোৎসব (প্রিয়রঞ্জন ভকত)..... ৬
বাংলাদেশ দূতাবাসের শুভেচ্ছাবার্তা..... ৭
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা (শৈলেন্দ্র নাথ মৈত্র)..... ৮
বকলমা' 'আমমোক্তারি' 'শরণাগতি' (স্বামী সুপর্ণানন্দ)..... ১১
চাঁদে ভ্রমণ - এখন কোন অলীক কল্পনা নয় (অরুনিমা ব্যানার্জী)..... ২০
সন্ধের ডানা (সোমদত্তা)..... ২২
দূর্গা পূজা (সমরেন্দ্র কুমার দত্ত)..... ২৫
সত্যি ডাকাতের গল্প (ইন্দ্রনীল সিংহ)..... ৩৭
কাজ ভাঙা দিন (শর্মি চক্রবর্তী)..... ৪৫
দিগন্ত শেষে (মৌমিতা ঘোষ)..... ৪৬
কাজ করে চলে (সঞ্জীব দাস)..... ৪৭
হঠাৎ (উদ্দালক ভরদ্বাজ)..... ৪৮
তখনই নেমে আসে সন্ধ্যা (সুচরিতা)..... ৪৯
উপত্যকা সংবাদ (উজ্জ্বল)..... ৫৩
নোংরা নোট (অর্ঘ্য দাস)..... ৬২
পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য মানব শরীর হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন (বিপ্লব পাল)... ৬৩
সময় (দেবাঞ্জন দত্ত)..... ৭৩
ছোট্ট পাখি (সমরেন্দ্র কুমার দত্ত)..... ৮১
আমার ইউরোপ ভ্রমণ (সুজয় চ্যাটার্জী)..... ৮২
মাতৃবন্দনা (সীমা পাল)..... ৮৪
অনেক দিন (উদ্দালক ভরদ্বাজ)..... ৮৯
লিংশপিং শহরের প্রথম বর্ষের (২০১৮) শারোদৎসব (সৌমিকা কাপাসী পাল). ৯০
কালীতীর্থ, কালীঘাট ইতিহাসের হাতছানি (শুভদীপ রায় চৌধুরী) ৯৩

COPYRIGHT © 2019 stockholmpuja.com

সূচীপত্র Content

ENGLISH / SWEDISH LITERACY WORKS

Sarbojonin 'Inclusiveness , equality and sharing' (Ayon Chakraborty)..... 12

Believe – Pray – Repeat (Akshi Gaur Agrawal)..... 14

Ma Durga (Amanita Sen)..... 16

The Incredible World Cup Final Finish (Ritesh Bhattacharya)..... 17

KID's CORNER 26

Kid's Corner Solution 29

Min resa till Legoland (Sristi Chatterjee)..... 30

Apollo 11 (Rohin Banerjee)..... 31

A bad dream (Achirshman Dev)..... 34

Den avundsjuka Tjejen (Författare: Sukumar Ray /Översättning av: Ditipriya Mitra Ray)..... 35

IVL Swedish Environmental Research Institute success story in India (Rupali Deshmukh)..... 39

At a Memorial in Berlin (Amanita Sen)..... 42

Just Like Me (Madhurya Dattagupta)..... 44

"Are you working?"and other pet peeves (Manjoori Ganguly)..... 56

6 chapters (Tridibesh)..... 59

Movies For My Mom (Debashish Chatterjee)..... 66

Festivals Then and now (Parvati Sastri)..... 68

Free Migrations (Reshmi Ghosh)..... 70

I rarely write poems anymore (Siddharth Saurabh Sahu)..... 72

Ilish Paturi in Sverige (Sourjya Chowdhury)..... 74

A Bird Story (Suvradeep Mitra)..... 77

Shahid Tirtha (Moumita Biswas)..... 86

Tagore's Mosaic Songs (Santanu Dasgupta)..... 92

SSPC's Social Responsibility in association with Patrasayer Welfare Society (Arka Mukherjee)..... 100

COPYRIGHT © 2019 stockholmpuja.com

সম্পাদকীয়

ঋতুচক্রের আবর্তনে গ্রীষ্ম ,বর্ষা ,শরৎ, হেমন্ত, শীত ,বসন্ত একে একে প্রকৃতির বুকে দেখা দেয় । বর্ষার সজল কালো মেঘ কোন বিরহবেদনা বয়ে আনে জানা নেই। কিন্তু বর্ষা অবসানে যখন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে,নদীচরে কাশফুল আর দখিনা বাতাসে দিগন্তপ্রসারী ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়, তখন মন যেন কিসের টানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে । স্টকহোমের আকাশে সারাবছর মেঘের আনাগোনা হয় । এখানে শিউলির গন্ধে ভ্রমর আকুল হয়না ।ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে না ।নীল আকাশে সাদা মেঘ ক্ষণিকের তরে দেখা দিলেও ব্যস্ত মানুষের চোখে পড়ে না । তবুও শরৎ আসে। গাছে গাছে পাতার রং ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় ,তখন মনে হয় Autumn এসেছে । ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ পরে ,হিসাব হয় মা কবে আসবেন।ক্ষণকালের জন্য ব্যস্ত জীবনে ছন্দপতন হয়,দেহে মনে আনন্দের ছায়া অনুভব হয়।

স্টকহোমে মা দোলায় আসেন না, গজেও আসেন না । বঙ্গের কোন এক শিল্পীর তৈরি মূর্তি বিমানে করে অরলান্ডা বিমান বন্দরে এসে উপস্থিত হয় । ভক্তজনেরা আনন্দে মেতে ওঠে। প্রতিদিনের ব্যস্ত-সমস্ত জীবন থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি - যেখানে কোনো কাজের তাড়া থাকবে না, শুধুই আনন্দ । সেই আনন্দময় পরিবেশে পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবে। দুর্গাপূজার দুটো দিক আছে - এক বাইরের বর্ণময় উৎসবের আয়োজন অন্যদিকে ভক্তিভরে মায়ের পূজা-অর্চনা । শিশুর মতো আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করে বলা মা শক্তি দাও, ভক্তি দাও ,প্রেম দাও । যে পরশমনির অন্বেষণে মানুষ ছুটে বেড়ায় তুমি তার ছোঁয়া প্রাণে দাও । প্রাণে এই আকুলতা নিয়ে স্টকহোম সর্বজনীন দূর্গা পুজা কমিটি আজ সপ্তম বর্ষে মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়েছে ।

সনাতন ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এই ধর্ম মানুষকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার মন্ত্র দেয় না ।দেবতাকে শুধু দূর থেকে অঞ্জলি দেওয়া নয় , তাকে নিজের ঘরে কখনো কন্যারূপে কখনো বা মাতৃরূপে আপ্যায়ন করা । যেখানে নানা উপচারে দেবীর পূজা হয় ,মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে জীবন ধন্য হয় সেখানে মায়ের কাছে শুধুমাত্র চাওয়া নয় সেই সঙ্গে সকল প্রাণীকুলের শান্তি কামনা কর হয়। অপরপক্ষে মা জগৎ জননী দীন নন । তিনি ব্রম্ভান্ডের সকল সৌন্দর্যের আধার , তাকে সেইভাবেই সাজানো হয় । সেখানে শিল্পের নানা রূপের প্রকাশ ঘটে । নানা আভরণে মাকে সাজানো হয় । নানা ভূষণে ভূষিতা হয়ে ভক্তের সামনে মায়ের আগমন হয় । মা শুধুমাত্র দশপ্রহরণধারিণী অসুরদলনী নন, মা সন্তানের কাছে স্নেহময়ী বরদাত্রী। দুঃখ কষ্ট জাগতিক সকল কলুষতা হরণকারী মা ।

সেই মাকে শুধুমাত্র ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো যথেষ্ট মনে হয় নি , তাই ভক্তজনেরা নৃত্য সংগীতের মাধ্যমে মাকে স্মরণ করে, নিজেরাও আনন্দে মেতে ওঠে। সনাতন ধর্ম কোন dogma নয় । মায়ের পূজা এখানে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। মৃন্ময়ী মূর্তির আরাধনা করতে যেয়ে বিশ্বচরাচরের সকল কিছু তার পূজার উপাচার হয়েছে । সবাইকে কাছে ডেকেছে ,উদ্ভিদ প্রাণী এমনকি প্রাণহীন বস্তুর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছে । তাই মাতৃমন্দির অঙ্গনে নৃত্য এল, সংগীত এল, শিল্পের নানা রূপ প্রকাশ পেল, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যেরও আগমন ঘটে । মানুষ চায় সর্বজনের কাছে নিজের ভাব প্রকাশ করতে, বিশ্বজননীর কাছে চায় নিজের আর্তি জানাতে। সকল চাওয়া-পাওয়া ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায়। সেই সকল ভাবনা প্রকাশের সফল প্রচেষ্টার ফসল এই লিখনের প্রকাশ। প্রবাসে যারা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন তারাও সাহিত্য ভালোবাসেন, নিজের মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে চান । লিখনে তাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল। সবার সুচিন্তিত লেখা প্রকাশে লিখন আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে এই আশা রাখি ।

লিখন প্রকাশের সময় বারেবারে মনে হয়েছে এটা কোন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র নয় বা কোন সাহিত্য সভার প্রচার পুস্তিকা নয় , লিখন একান্তই শারদ উৎসবে যাদের উপস্থিতি তাদেরই সকল চিন্তা ভাবনা প্রকাশের স্থান । নানা ব্যস্ততার মাঝে যারা লিখনের জন্য লেখা দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। নানা স্বাদের লেখা এখানে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে । লেখক-পাঠক প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দ মত নানা বিষয়ের উপর লেখার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন। সর্বজনীন কথাটার অর্থ সর্বসাধারণের জন্য ,অন্যদিকে সার্ব কথাটির অর্থ Universal । অর্থাৎ এখানে কাউকে পৃথক করে রাখা হয়নি। সবারে করি আহ্বান । কবি বলেছেন -মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা ,মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা / সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য লিখনের আমন্ত্রণ রইল। আগামী লিখনের কলেবর আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সকল পাতা আরও বর্ণময় হয়ে উঠবে। লিখন প্রকাশে যারা নানাভাবে সাহায্য করেছে সবাইকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। ভুলত্রুটি যা আছে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী ।

দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাতে মাতৃরূপে যে শুভ শক্তির আরাধনা শুরু হয় বিজয় দশমী অন্তে শুভশক্তির জয়ধ্বনি দিয়ে যেন বলতে পারি - হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে নিত্য হানাহানি বন্ধ হোক। মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক। এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ যেন তার সকল ভালোটুকু নিয়ে শান্তিতে বাঁচতে পারে ।

সর্বশেষে লিখনের সকল পাঠক, লেখক, লেখিকা, শিল্পী, এবং শুভানুধ্যায়ীকে বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি।

- সম্পাদকের কলম থেকে
জয়দীপ ব্যানার্জী & অয়ন চক্রবর্তী

এই সময়
YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI

THE TIMES OF INDIA

প্রবাসে দুর্গার বশে

সুইডেনের মাটিতে শারদীয়ার জয়গান

EiSamay.Com | Updated:Sep 20, 2019, 03:28PM IST

সুইডেনের মাটিতে শারদীয়া

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

স্টকহোম সর্বজনীন পুজো কমিটি সুইডেনের অন্যতম হিন্দু সংগঠন। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি এখানে অন্য অনেক পুজো আয়োজিত হয়। বাদ যায় না পয়লা বৈশাখ উদযাপনও। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া বয়েসে নবীন দুর্গাপুজোটি হইহই করে এগিয়ে চলছে। প্রায় তিন চার হাজার বাঙালি এই পুজোয় অংশ নেন। নরডিকের অন্যতম বড় পুজো এটি।

পুজোর ম্যাগাজিন নিয়েও যথেষ্ট মনোযোগী এঁরা। প্রতিবছরের মত এবারও পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন বিখ্যাত লেখক যেমন রামেন্দু মজুমদারের লেখাও প্রকাশিত হয়েছে আগের বছরের পূজাবার্ষিকীতে। পরবর্তী প্রজন্মদের বাঙ্গালী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে তাঁদের লেখা বিভিন্ন গল্প, আঁকা বিভিন্ন ছবিও এঁরা পুজোর ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। ভোগ, অঞ্জলি সেসবের এলাহি আয়োজন তো থাকছেই। ভীষণ আকর্ষনীয় এবারের অনস্টেজ কমেডি, "মহাদেবের স্টকহোম ভ্রমণ"।

ফেসবুক পেজ : https://www.facebook.com/StockholmSarbojoninPujaCommittee/

ওয়েবসাইট :www.stockholmpuja.com

above article was published in "**Ei Samay**", a leading Bengali newspaper

বাংলা মায়ের আগমনের আদিকথা

শ্রী বিষ্ণু চক্রবর্তী

বৈদিক যুগ থেকেই দূর্গা নারী শক্তির প্রতীক। এই জগত জননী মহামায়া দশভূজা রূপে বাংলায় পূজিতা। বাঙালি সমাজে মায়ের আগমন নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। অখন্ড বাংলার রাজধানী কলকাতাতে মায়ের আগমন নিয়ে কিছু আলোচনা করা হলো।

ঐতিহাসিক সন তারিখের বিচারে বাংলায় প্রথম দূর্গা পূজা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক। একদল মনে করেন তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৬০০ শতকের শেষদিকে দেবীর পূজা শুরু করেন। অন্যদল মনে করে নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ সালে প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন।

কলকাতা সবচেয়ে প্রথম দুর্গাপূজার হয় চারশত বছর আগে বাগবাজারে। আরম্ভ করেছিলেন প্রাণকৃষ্ণ হালদার। পুজা হয়েছিল কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তিতে। এই পূজোতে কিন্তু দূর্গার সঙ্গী তার ছেলেমেয়েরা ছিল না। ছিল তার দুই সখী জয়া -বিজয়া। ১৬১০ সালে বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা শুরু করেন লক্ষ্মীকান্ত রায় মজুমদার। সে যুগে এ পরিবার সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরবর্তীকালে এই তিন গ্রাম নিয়েই গড়ে ওঠে কলকাতা শহর। তাই ১৬১০ সালের এই পূজাকে কলকাতার অন্যতম প্রাচীন দূর্গা পূজা বলা হয়। সেই থেকে যুগে যুগে কলকাতার বনেদি পরিবারের দূর্গাপূজার প্রচলন।

বৈষ্ণবঘাটা ভট্টাচার্যরা, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ পরিবার আর ঠনঠনিযার ঘোষেরা ৩০০ বছর ধরে দূর্গা পূজা করে আসছেন। ১৭৫৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণ দেব দূর্গা পূজা করেন এক বিজয়উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভকে তিনি সাহায্য করেন। তার শুরু করা পূজা বিখ্যাত হয়েছে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো নামে। অল্পদিনের মধ্যেই দর্জিপাড়ার মিত্রবাড়ি, হাটখোলার দত্তরা, ছাতুবাবু- লাটুবাবুদের বাড়িতেও শুরু হয় পারিবারিক পুজো। ধীরে ধীরে কলকাতার বনেদি পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে দূর্গা পুজো।

১৯ শতকের শেষ অব্দি এই রীতি চলতে থাকে। তিনশো বছর ধরে এই পুজো পারিবারিক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। পুজো হত পরিবারের মধ্যে। পুজোর আয়োজন খরচপত্র সবই করতেন পরিবারের লোকেরা। পুজো দেখতে আসতেন পাড়াপ্রতিবেশীরা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল গৌরীমাতা উদ্যানের পূজা। শ্রীরাম কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং সারদা দেবীর ঘনিষ্ঠ গৌরীমাতা বাগবাজারে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ১৮৯৫ সালে দূর্গা পূজা শুরু করেন। সেই পূজা আজও চলছে। এখনো প্রতিমার পরিবর্তে হয় পট পূজা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলায় নবজাগরণের ঝড় ওঠে আর সেই টলমল করে ওঠে বহু বছরের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি। সনাতনী বাড়ির পূজোর কঠোর বিধিনিষেধ কে খানখান করে জন্ম নিল সর্বজনের বারোয়ারি পূজোর। বাড়ির পুজোর জায়গা ছেড়ে দিল বারোয়ারি পূজোকে।

প্রথম বারোয়ারি পূজা শুরু হয় হুগলির গুপ্তিপাড়ায় কিন্তু সেটা ছিল জগদ্ধাত্রী পুজো। গুপ্তিপাড়ার এক বাবু অর্থাভাবে পুজো করতে পারছিলেন না। তখন ১২ জন বন্ধু এসে চাঁদা তুলে এই পুজো করেন। সেই থেকে নাম হয় বারোইয়ারি পূজা। কলকাতার প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় বিংশশতাব্দীর গোড়ায় দক্ষিণ ভবানীপুরে, উত্তর বাগবাজার আর সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে। এই তিনটে পুজো আজও হয়।

আজ কলকাতার বেশিরভাগ পূজোই বারোয়ারি,শুধু হাতেগোনা কিছু বনেদি বাড়ীর পুজো কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায়। বারোয়ারি পুজোর জাঁকজমকের সঙ্গে বাড়ির পুজোর তুলনা চলেনা। বারোয়ারি পূজায় বড় বড় প্যান্ডেল, যেমন তার সাজ, তেমন তাতে আলোর খেলা। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বাড়ির পুজো নেহাতই টিমটিমে। তবু কি যেন আছে বাড়ির পূজোতে। লাল পাড় শাড়ি পরা বাড়ির মেয়ে বৌয়েরা যখন অঞ্জলি দিতে নামেন কিংবা সন্ধিপুজোয় প্রদীপের সারির সামনে বসেন তখন তার মাধুর্যই আলাদা। বারোয়ারি পূজা শত সহস্র ঝাড়বাতি সেই মাধুর্যকে টেক্কা দিতে পারে না। তবু বারোয়ারি পুজো চলছে এবং চলবে। সাধারন মানুষের প্রতীক হয়ে চিরকাল।

১৯০১ সালে শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের গড়া বেলুড় মঠের পুজো। মায়ের সেখানে বাঁধা আসর। সেখানে জগজ্জননী যেভাবে আসলেন। একদিন সকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি স্বপ্ন দর্শনের কথা জানালেন স্বামী বিবেকানন্দকে। তিনি দেখেছেন যে দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকায় আসছেন মা দুর্গা এবং থেমেছে বেলুড় মঠের ঘাটে। শুনে স্বামীজীও বললেন বেলগাছ তলায় আমিও দেখেছি মা আসছেন। এবার পূজো করতেই

হবে। স্বামীজীর এককথায় অসম্ভব দ্রুত প্রস্তুতি শুরু হলো। পুজোর মাত্র কয়েকদিন আগে সঙ্ঘজননী মা সারদার অনুমতি নিয়ে এক ব্রহ্মচারী প্রতিমার সন্ধানে কুমারটুলিতে গেলেন। সেখানে একটি মাত্র প্রতিমা ছিল। সেই প্রতিমা দিয়েই ১৯০১ সালে সারদা মায়ের উপস্থিতিতে শুরু হলো বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো। মায়ের এখানে বাঁধা আসর ,আসেন জগতের কল্যাণে। যথারীতি এবারও মা এসেছে সেখানে তারা আসন আলো করতে।

এক রকম বিনা প্রস্তুতিতে ১১০ বছর পূর্বে পূজার সূচনা হয়েছিল, আজ তার প্রস্তুতি চলে প্রায় সারা বছর ধরে। দেবীর মহাপ্রস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের তেল, মাটি, এসব দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সংগ্রহ চলে বছর ধরে। জন্মাষ্টমীতে হয় কাঠামো পুজো। একই পূজারীর পৌরহিত্যে সে বছরের মহাপুজো হয়। সন্ন্যাসীরা বিধিমতো দূর্গাপূজার অধিকারী নন। তাই শিখাসূত্রধারী ব্রহ্মচারী এই পুজো করেন। বৃহন্নান্দিকেশর মতে দূর্গাপূজার বিধি প্রথম বছরেই রচনা করেন সাধক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ইশ্বরচন্দ্র ছিলেন ওই পূজোর তন্ত্রধারক। আজও পূজা হয় সেই পুরাতন পুঁথিকে সামনে রেখে।

মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অচ্যুতানন্দ পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করে বলেছেন যে, তিনি যখন নবীন পূজারী ,তখনো সংঘের পূজা শাস্ত্রের জীবন্ত অভিধান' স্বামী ওঙ্কারনান্দ জীবিত ছিলেন এবং তিনি শিখিয়েছেন 'মা এখানে বিধিময়ী ,তিথিময়ী ও ভাবময়ী। কোনো খামতি ,কোনো শর্টকাট কোন madeasyr স্থানে এই পুজোয় নেই।' অর্থাৎ পুজো করতে হবে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধি মেনে, পঞ্জিকা বর্ণিত সময় মেনে এবং জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ ভাবনায়।

মঠের ১৬৬ শাখা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৫টির মধ্যে এখন পুজো হয়। সেগুলির মধ্যে বহির্ভারতে ৬টি। তার মধ্যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের পূজো উল্লেখযোগ্য। অষ্টমীর দিন কুমারীপুজোতে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় এই পুজোতে। বেলুড় মঠ থেকে তিনলক্ষ নিমন্ত্রণ পত্র বিলি হয়। ষষ্ঠী থেকে সপ্তমী পর্যন্ত চলে চণ্ডীপাঠ। স্থানীয় জগন্নাথ মন্দির থেকে নারায়ণ শিলা আনা হয়। পুজোর তিনদিনই দেবীকে আমিষ অন্নভোগ দেওয়া হয়। সন্ধিপুজোয় কালিঘাট থেকে আনা প্রসাদী মাংস দেওয়া হয় দেবীকে। শিব ও নারায়ণের জন্য চড়ানো হয় নিরামিষ ভোগ। মা সারদা দেবীর নির্দেশে মঠে প্রানী বলি নিষিদ্ধ বলে চালকুমড়ো, আঁখ ও কলা বলি চালু হয়েছে। বেলুড় মঠের বিশেষত্ব কুমারী পূজা। নয়টি কুমারী দিয়ে পুজো শুরু হলেও বর্তমানে একটি কুমারী দিয়ে কুমারী পূজা হয়।

১৫৩০ সালে প্রভু নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপূজা খড়দহের গঙ্গাতীরের কুঞ্জবাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই বৎসর এই পুজোয ৪৭৭ তম বছরে পরিণত হোলো। ১৫৩০ সালে শরৎকালের কৃষ্ণপূজারী নিত্যানন্দ প্রভু জগন্নাথ ধাম থেকে বাড়ি ফিরেই মায়ের আগমনের গন্ধ পেলেন এবং নিজ হাতে দশভুজার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্টিত পূজোটি একটু ব্যতিক্রম দশোভূজার পূজা, সেখানে পূজিতা হয় দশভুজার কাত্যায়নী রূপ। শোলার সাঁজের একচালা প্রতিমার দুই পাশে তার দু'সখী জয়া আর বিজয়া। প্রথমার দিন থেকেই মাতৃ আরাধনা শুরু হয়। মহাষষ্ঠীতে বোধনের পরে দেবীকে সিংহাসনে তোলা হয়। সেই পুরনো রীতিতেই এখনো সেখানে পুজো চলছে। এখানকার পুজোতে আড়ম্বর হয় না, প্রাচীন উপাচারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুরুতে পূজাটি ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ির পুজো। তারপর হয়েছিল বারোয়ারি এবং সার্বজনীন।

পশ্চিমবঙ্গের পুরনো পূজার মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পুজো কলুটোলার গোপাল চন্দ্র রায় পরিবারের। ১৮৫৮ সালে বদনচাঁদ রায়ের বাসভবন থেকে পুজোটি শুরু হয়।

শারদীয় মহোৎসব

প্রিয়রঞ্জন ভকত

বাঙালির শারদীয় উৎসব কথাটির ব্যাপক অর্থ সকলকে নিয়ে আনন্দে উদ্বেল হওয়া। যে উৎসবে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাকে সার্বজনীন বলা যায় না। সময়ের সঙ্গে উৎসবের আয়োজন বাড়ি থেকে সার্বজনীন হয়ে ওঠার মধ্যে এ সত্যের পরম স্বীকৃতি। সত্যিই কি আমরা সার্বজনীন হতে পেরেছি তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু প্রতিবছরই নতুনভাবে আয়োজনের মাধ্যমে সার্বজনীনতা কে স্বীকার করে তার দিকে এগিয়ে চলি।

স্টকহোম সার্বজনীন পুজা কমিটি (SSPC) সার্বজনীনতাকে লক্ষ্য মেনে নিয়ে সপ্তম বছরে পা রাখলো , পথ চলা শুরু হয়েছিল 2013 এর সরস্বতী পুজো আয়োজনের মাধ্যমে। এই উৎসব ধর্ম ,বর্ণ , বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরে ঠেলে রেখে সকলের মহামিলনের পরিসর। তবে আমাদের বিশ্বাস ও রীতিকে সম্মানে সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

বিপুল জনসমাগম এর জন্য এই ৭ বছরে চার বার পূজা প্রাঙ্গনের স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে রয়েছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি অথবা কাজের দিনে পূজা প্রাঙ্গনের ভাড়া অত্যন্ত বেশি যা SSPC-র বহন করা প্রায় অসাধ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভালো পূজার আর্থিক দায়ভারের বৃহৎ অংশ আয়োজকরা বহন করেন । তদুপরি সমস্ত আয়োজন নিজের সময় ও শ্রম দিয়ে আয়োজকরাই করেন। কোনোরূপ সুইডেনের সরকারি সাহায্য পায় না। তাই সকলের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন SSPC-কে আপনাদের আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সুইডেনের বুকে দীর্ঘায়িত করুন। এটি শুধু আপনার জন্য নয় , আপনার পরবর্তী প্রজন্মকেও তাদের শেকড়ের সন্ধান দেবে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় গত বছরও বিপুল সমাবেশ ও উদ্দীপনা সকলের নজর কেড়েছে।
দুর্গাপূজার দিনগুলিতে নাচ ,গান ,আবৃত্তি, নাটক ও ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের মন জয় করে। আগত সকলকে এই দিনগুলিতে দুপুরে ও রাত্রে খাবার সহকারে আপ্যায়িত করা হয়।

কালী পূজা উপলক্ষে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে স্টোকহোমস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি মনিকা কাপিল মেহেতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে SSPC-র প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সুইডেনে প্রসারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শ্রী মোঃ নাজমুল ইসলাম পূজা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং SSPC-র প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন শুভর কাছে অশুভর পরাজয় এবং সত্য ও সুন্দরের বন্দনাই হল এই উৎসবের মূলসুর। এই উৎসব অন্যের প্রতি সহযোগিতা ,সহমর্মিতা, বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা শেখায়। উৎসব যে মানব জাতির এক বড় সম্পদ তাও তারা উল্লেখ করেন।
এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে , এই সংগঠনে কোন তথাকথিত পদ বিভাজন নেই কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চেয়েছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা প্রয়োগের জন্য মাঝে মাঝে দায়িত্ব ভাগ পরিবর্তন করা হয়। যে কারণে সম্প্রতি আহ্বায়ক , সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মারক পত্রিকা, পূজা পরিচালন সমিতির বিভিন্ন বিভাগের পরিবর্তন করা হয়েছে। আবার কয়েকটি বিভাগে সরাসরি যোগাযোগের জন্য নতুন ইমেল আইডি তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুসারে এর পরিবর্তন করা হবে বলে আশা করা যায়।
আপনাদের সকলের উপস্থিতি , সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সাহায্যে SSPC-র শারদ উৎসব সাফল্যমন্ডিত হবে এই আশা রাখি।
সবশেষে মায়ের কাছে সকলের সুস্থ, সবল, নীরোগ, দীর্ঘায়ু কামনা করি।

Ambassador

EMBASSY OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH
ANDERSTORPSVAGEN 12 (1 TR.)
SE-171 54 SOLNA, SWEDEN
TEL: +46 8 730 58 50 -52
FAX: +46 8 730 58 70

বাণী

আবহমানকাল ধরে পালিত হয়ে আসা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব এবং বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা বছর ঘুরে এসেছে আবার সকলের দ্বারে। সকলের মাঝে তাই সঞ্চারিত হয়েছে উৎসবের আমেজ আর প্রকৃতিতেও লেগেছে আনন্দের মেলা।

পালা পার্বনের বাংলাদেশে যে কোন উৎসব পালিত হয় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে। একেকটা উৎসব কালক্রমে পরিগণিত হয়ে আসছে তাই সকলের উৎসব হয়ে। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ তাই হয়ে উঠেছে সকল ধর্মের সকল মানুষের পারস্পারিক মূল্যবোধের সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আমাদের সংবিধানও ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের রক্ষাকবচ। ধর্ম যার যার উৎসব সবার- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদার ও রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে আরো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অন্যায়, অবিচার, অশুভ ও অসুরশক্তি দমনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাই দুর্গা পূজার মূল বাণী। জাতি হিসেবে আমাদেরও একই ব্রত-সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। নানা উপাচারে আর অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালিত এ সার্বজনীন উৎসব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সুসংহত করতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে; মানুষের সাথে মানুষের আর মানুষের সাথে প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটায়।

প্রবাসীদের জন্য এ সার্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন নিঃসন্দেহে অনেক কষ্টসাধ্য আর এর পাশাপাশি এ উপলক্ষে প্রকাশনা বের করা সত্যিই দুরূহ কাজ আয়োজকরা যা সাবলীলভাবে করে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। প্রতিবারের মতো আয়োজকদের এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে আবারও আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

এ অঞ্চলে বসবাসরত সকল বাঙালি ভাই-বোনদের প্রতি আবারও রইলো শারদীয় দূর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ নাজমুল ইসলাম
রাষ্ট্রদূত

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

শৈলেন্দ্র নাথ মৈত্র

ষড়ঋতুর এমন মনোরম বহিঃপ্রকাশ গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা বিধৌত বঙ্গভূমে যেমনটি প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনটি অন্য কোন ভূখণ্ডে প্রতিভাত হয় না। নিদাঘের প্রখর দাবদাহে বিশ্বচরাচর তৃষ্ণাতুর হয়, বৃষ্টিবিহীন বৈশাখের দিনে সমগ্র জীবকুল চাতক পাখির মতো উর্দ্ধ আকাশে চেয়ে থাকে তৃষ্ণার্ত নয়নে। তারপর আষাঢ়ের প্রথম বেলায় নীল আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা আরম্ভ হয়। বৃষ্টিধারা যেন অমৃতধারার মতো জীবকুলের কাছে নেমে আসে। উদ্ভিদ প্রাণী সকল জীব সেই জলধারায় সিক্ত হয়, প্রাণ ফিরে পায়। শ্রাবণের অঝোর ধারা যখন ধরার বুকে অঝোরে ঝরে তখন প্রকৃতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। অনেকে বর্ষা ঋতুকে দুঃখের ঋতু হিসাবে অভিহিত করেন। বাদল ধারার সঙ্গে অশ্রুধারার কি সম্পর্ক আছে কবি জানেন। তাই তিনিই বলতে পারেন - আমি শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি / মম জল ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে। আকাশে কালো মেঘ, অঝরে ঝরে পড়া বারিধারা, প্রকৃতির এই সরস রূপ কেন জানিনা মনকে উদাস করে। কোন কাজেই মন লাগে না। তারপর বৃষ্টি বয়ে আনা মৌসুমী বায়ু একদিন তার নাচন সাঙ্গ করে কালের পথে যাত্রা করে। বর্ষার অবসানে আসে শরৎ - প্রকৃতির সে এক অপরূপ রূপ। নীল আকাশের বুকে ভেসে চলে সাদা মেঘের ভেলা, উড়ে চলে বকের ঝাঁক। নদীর চরে কাশফুলের মেলা। মাটির ঘরের দাওয়ার ওপাশে শিউলি ফুলের গন্ধে মন আকুল হয়। চারিদিকে সবুজের সমারোহে মন সজীব হয়। ধানের ক্ষেতে মন্দ বাতাসে যে ঢেউ খেলে যায়, প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপ মানুষের মনেও দোলা দেয়। রূপে রসে গন্ধে ভরা সেই প্রকৃতি মনকে আবিষ্ট করে। সুখ-দুঃখের অতীত নিত্যদিনের জীবনধারায় যে আনন্দময় জগত আছে মানুষ ক্ষনিকের তরে হয়তো বা তার সন্ধান পায়। তাই সে মেতে ওঠে শারদীয় আনন্দ-উৎসবে। তারপর একে একে আসে হেমন্ত, শীত, বসন্ত। বিভিন্ন ঋতু নানা রূপের পসরা নিয়ে এই ধরায় আসে। প্রকৃতি ও জীবকুল তার পরশ অনুভব করে মেতে ওঠে বাঁধনহারা জীবন ছন্দে। এভাবেই প্রাণ বাঁচে।

শরতের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে এদেশে দশভুজার আরাধনা আরম্ভ হয়েছিল। কেন এই ঋতুতে কে বা কারা এই মাতৃপূজার সূচনা করে সে তর্কে পণ্ডিতেরা সময় ব্যয় করুক, আমরা অভাজন কেবলমাত্র মায়ের চরণ বন্দনা করে ধন্য হই। বর্তমানে মায়ের যে রূপ আমরা পূজা করি তার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ নিয়ে যদি একটু চিন্তা করা যায়, তবে অবাক হতে হবে। কাঠামোর ভেতরে একদিকে দনুজদলনী মা দূর্গা স্বয়ং মধ্যস্থলে বিরাজ করেন। সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং কার্তিক-গণেশ উপস্থিত। শিব ঠাকুর অলখে অবস্থান করে সবই প্রত্যক্ষ করেন; অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি যে সৃষ্টির সমান অংশীদার তা বোঝা যায়। মূঢ়জন প্রকৃতির সেই সমান অংশীদারিত্ব অস্বীকার করতে চায় কিন্তু বিজ্ঞজনেরা সৃষ্টির দ্বিবিধ উপস্থিতিতে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুধুমাত্র মানুষ নয়, সকল জীবকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কখনো হিংস্র পশুকে বধ করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে। আবার কখনো মানবরূপী দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে লড়াই করে নিজ নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যখন একান্ত অসহায় বোধ করেছে তখন দেবতার স্মরণ নিয়েছে। সে দেবতা সাকার বা নিরাকার দুই ই হতে পারে। দৈত্য-দানবেরা যখন দৈববলে বলিয়ান হয়ে স্বর্গ মর্ত্য অধিকার করে নিল, তখনই দেবতারা মা দুর্গার সৃষ্টি করে। দশপ্রহরণধারিণী মা দৈত্য সংহার করে দেবতাকূলকে রক্ষা করেন। সেই সংগ্রামে পুরুষ ও প্রকৃতির সমান ভূমিকা আছে। আর মূর্তি সেইভাবেই কল্পনা করা হয়েছে। সঙ্গে আছেন কার্তিক ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। জীবকুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধন ও রত্নের প্রয়োজন, মা লক্ষী সেই ধনভান্ডার নিয়ে অধিষ্ঠিতা। কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারকরূপে মা সরস্বতী সমুপস্থিত। মা দেবতাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন জানা যায় না, কিন্তু বর্তমানে মা যে কিছুটা বিভ্রান্ত তা বর্তমান নর-নারীর আচরণেই বোঝা যায়। একসঙ্গে সকল দেব দেবীর উপস্থিতির মধ্যে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যখন সমাজবদ্ধ জীবে পরিণত হয় তখন তার নানা ব্যবহারিক প্রয়োজন তথা সামগ্রিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়. তাই লক্ষ্মীর আরাধনা অর্থাৎ মা দুর্গার সাম্রাজ্যে অর্থ মন্ত্রী হলেন মা লক্ষ্মী। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের একটা সামাজিক জীবন যাপনের জন্য কিছু শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। একসাথে বাঁচতে হলে কতগুলি বিধি-নিষেধ সকলকে মেনে চলতে হয় নইলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই প্রাথমিক কতগুলি শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই শিক্ষার ভার দেওয়া হয় সরস্বতী দেবীকে অর্থাৎ তিনি হলেন শিক্ষা মন্ত্রী। বৈদিক যুগে মাকে শিক্ষা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এদেশের শিক্ষার হাল দেখে মা স্টোকহোল্মে asylum নিয়েছেন নাকি গ্রীনল্যান্ডের শান্ত পরিবেশে লুকিয়ে আছেন - ইন্টারনেটে খবর নিতে হয়। মানুষ

সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে একটা সুস্থ সুন্দর জীবন কাটাতে হলে প্রত্যেকের কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে। সবার সঙ্গে সবার একটা আত্মিক যোগ থাকা প্রয়োজন। সিদ্ধিদাতা গণেশকে সেই সংযোগ রাখার ভার দেওয়া হয় অর্থাৎ তিনি হলেন যোগাযোগ মন্ত্রী। বর্তমানে ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে যোগাযোগমন্ত্রীর গুরুত্ব অসীম। আছেন কার্তিক; তিনি সুরবাহিনীর প্রধান অর্থাৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাঁর সেনাপতিত্বে সুরবাহিনী লড়াই করে দৈত্যরাজ মহিষাসুরকে খতম করেছে ; আর সুপ্রিম কমান্ডার যিনি সাধারণত রণক্ষেত্রের বহুদূরে অবস্থান করেন - তিনি স্বয়ং ভোলানাথ, অলখে থেকে দেবতাদের সকল কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রন করেন। মহান ভারতীয় গণতন্ত্রের concept টি দেবতারা ঠিক রপ্ত করতে পারেননি; তাই সুরলোকে একচ্ছত্র ডিক্টেটরশিপ চলছে। স্বর্গে মহান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মণ্ডপে মণ্ডপে the great dictator মহাদেবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে স্মারকলিপি দেওয়া যেতে পারে।
মানব সমাজের সঙ্গে প্রাণিজগতের একটা সুসম্পর্কের কথাও ভাবা হয়েছিল। দেবতাদের বাহনের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। একটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ইঁদুর থেকে অতি হিংস্র শক্তিশালী সিংহের একইসঙ্গে উপস্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ বলা যায়, সবল বা দুর্বল সকল জীবেরই একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। গণেশের কলাবৌ এর কল্পনা একটি অনুপম ধারণা (Unique concept)। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ে উভয়ের পরিপূরক এই ধারণাটি প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে পক্ষিকুলকেও অস্বীকার করা হয়নি। রাজহংস, পেঁচা, ময়ূরের উপস্থিতি লক্ষ্যকরা যায়। বাঁচতে হলে সবার সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন, দেবতাদের বাহন দেখে তাই বোঝা যায়। এই মূর্তি পূজার মধ্যে দিয়েই আমরা মানবজীবন ও সমাজ জীবনের নানা রূপ প্রত্যক্ষ করি।
সে যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এর কোন ধারণাই ছিল না। তখন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শাসন ব্যবস্থার কোনো তত্ত্ব ক্রিয়াশীল ছিল না। মানুষ অনেকটা সেই আদিম বর্বর যুগে বাস করেছে; সেই সময় এই জাতীয় ধারণা সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে নাকি ? একটা সভ্য শৃঙ্খলাপরায়ন সমাজ ব্যবস্থার ধারণা মানুষের মনে জাগে যখন মা দুর্গার মূর্তির দিকে দৃষ্টি পড়ে। শাস্ত্রে দেবতা ও দৈত্য উভয়েরই উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সমাজে ভালো-মন্দ দুই উপস্থিতি আছে। এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ সর্বদা রয়েছে। সময় সময় এই মন্দের কর্মতৎপরতা এত বৃদ্ধি পায় যে তাকে দমন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। তখন ঢোল হাতে নিয়ে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম গেয়ে দুষ্টের দমন হয় না। সেইজন্য মা দশপ্রহরণী , অর্থাৎ বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অসুর নিধনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।
বর্তমানে অসংখ্য মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একই প্রকারে মানুষ পরস্পরে শত্রূদমনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। সে যুদ্ধে সুর অসুর কোনও পার্থক্য থাকে না। মারণাস্ত্রের বৈচিত্র এবং তার মারণ শক্তি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এই মানবরূপী দানবের সুবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য কোন দেবতার আরাধনা করতে হবে মানুষ জানে না। তাছাড়া মায়ের পূজার উপাচারে নানা শষ্যের উপস্থিতি, নানা স্থানের জল এবং মাটির প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ জগৎকেও উপেক্ষা করা হয়নি; বেলপাতা, তুলসীপাতা থেকে আরম্ভ করে হরেক রকম উদ্ভিদের প্রয়োজন। পূজার প্রধান উপাচার ফুল যা প্রকৃতির সবচাইতে সুন্দর ও পবিত্র দান। সেই ফুল হাতে নিয়ে দেবীর চরণে অঞ্জলি দেয়, প্রার্থনা জানায় - এ এক অপার্থিব অনুভূতি। সৃষ্টির সকল অঙ্গকে এক স্থানে উপস্থিত করে দেবীর আরাধনা - এ এক অনুপম ধারণা। জল স্থল অন্তরীক্ষের সকল উপাদান একসঙ্গে উপস্থিত করে চেতন-অচেতন সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তির আরাধনা যুগ যুগ ধরে মানুষকে বাঁচার শক্তি জুগিয়েছে। মায়ের বন্দনা করতে গিয়ে প্রাণী জগতের সকল সৃষ্ট বস্তুর বন্দনা করা হয়েছে। উচ্চারিত মন্ত্রে বলা হয় - যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা। সর্বভূতে মায়ের বিচিত্র রূপ কল্পনা করে তার উপাসনা করেছে। সেই মন্ত্রী সবাইকে আহ্বান করেছে। সবার মঙ্গল কামনা করেছে। আজ সেই উদার , মহান ধর্মের অনুশাসনগুলির বিকৃতি ঘটিয়ে, মানুষ মানুষে প্রকৃতিতে বিবাদ বাধিয়ে সৃষ্টির বিনাশ ঘটাতে চাইছে; অর্থাৎ ধরার বুকে আবার অসুরের আবির্ভাব ঘটছে। অতএব দনুজদলানি মায়ের আরাধনার আরো ব্যাপক আয়োজন প্রয়োজন।

একশত বছরের অধিককাল পূর্বে বঙ্গসমাজে বারোয়ারি পূজার প্রচলন হয়। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার পরে কলকাতার গঙ্গার ধারে বাগবাজার ও কুমারটুলিতে দুটি বারোয়ারি পূজার সূচনা হয়। আজ এদেশে মণ্ডপে মণ্ডপে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা মন্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন এর যে রীতি ব্যাপক ভাবে চালু হয়েছে তার প্রথম সূচনা হয় বাগবাজারের সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বারা। সেই সময়ে সমাজের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো. একবার বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয় মন্ডপ উদ্বোধনের জন্য। তিনি উপস্থিত হয়ে মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেন। চারিদিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে উপস্থিত কর্মকর্তাদের ডেকে বললেন - তোমরা মাতৃ পূজার অঙ্গনেও

ফ্যাশন ডেকে আনলে, কিন্তু এ ফ্যাশন তো এখানেই থেমে থাকবে না। নব নব রূপে বিকশিত হবে। তখন এই ফ্যাশনই প্রধান হয়ে উঠবে, মাতৃপূজা গৌণ হবে। সেখানে আবেগ থাকবে না, আকুলতা থাকবে না। মা মৃন্ময়ী হয়ে থাকবে , চিন্ময়ী রূপে আবির্ভূতা হবে না। এই কথা বলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। দ্বারের ফিতে কাটা হলো না। পাশে প্রদর্শনী ও দেখা হলো না। গম্ভীর পায়ে ফিরে এলেন। আজ একশত বৎসর পরে আচার্যের সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ ভক্তিভরে মায়ের আরাধনা নয় ,শুধু ফ্যাশানের দাপাদাপি। ভক্তিভরে কেউ মাকে ডাকে না। আকুল হয়ে কেউ মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায় না। চারিদিকে ফ্যাশন আর আলোর ঝলকানি - মানুষ বিভ্রান্ত হয়। মূঢ়জন জানেনা - মা তো ভিখারি নন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ঐশ্বর্য্যের মালিক তিনি। তার সামনে ঐশ্বর্য্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত হলে মা সন্তুষ্ট হন না। মা ভক্তি চান, সন্তানের আর্তি শুনতে চান। আজকে পূজা প্রাঙ্গণে কর্পোরেট সেক্টরের দাপাদাপি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন নইলে এই শারদ উৎসব একটা মেঠো উৎসবে পরিণত হবে।

আজ সারা বিশ্বে নারী জাতির প্রতি অত্যাচার অবিচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। নারী আজ কন্যারূপে স্নেহের পাত্রী নয় , বধূরূপে ভালোবাসার পাত্রী নয়, মাতৃরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রী নয়। নারী এখন একান্তই সস্তা পণ্য , আলু পটলের মত হাটে বাজারে বিক্রি হয়। পয়সা দিলেই ইচ্ছেমতো কিনতে পাওয়া যায়। নারীর মর্যাদা কেউ দিতে জানে না ; না নর , না নারী - সবাই একই দৃষ্টিতে তাকে দেখে। অথচ এই দ্বিস্পদ (Biped animal) প্রাণীরা মায়ের মূর্তি গড়িয়ে , তার সামনে দাঁড়িয়ে , হাতজোড় করে বলছে - রূপং দেহি , জয়ং দেহি , যশো দেহি। এই ভণ্ডামির অবসান প্রয়োজন। বাইরে মায়ের সামনে ফুল হাতে মন্ত্র উচ্চারণ করে তার পায় অঞ্জলি দেবো, আর ঘরে ফিরে সেই মাতৃজাতির ওপর নির্যাতন চলবে - এই দ্বিচারিতার সরব প্রতিবাদ দরকার।

আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ, অনুভূতি ,মনুষ্যত্ববোধ। দয়া মায়া মমতা - ল্যাপটপ আইপ্যাড আইফোন এর তলায় চাপা পড়ে গেছে। আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এইসব যন্ত্রের আবিষ্কারকর্তারা পর্যন্ত তারস্বরে চিৎকার করে বলছে, এই যন্ত্রদানবের জয়যাত্রা থামাও নইলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। সারা বিশ্বজুড়ে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, প্রকৃতির উপর নির্মম আগ্রাসন। হিংস্র প্রাণঘাতী বিবাদ দেখে মাঝে মাঝে ধন্দ লাগে; মনে হয় সভ্যতার রথ আবার কি back gear এ চলা শুরু করেছে ! দেশে দেশে মানুষের হিংস্র আচরণ কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে! অসুরের সংখ্যাধিক্য, তাদের অসুস্থ কর্মকাণ্ড , সুরলোকের অস্তিত্বই বিপন্ন করতে চলেছে। আজ মায়ের কাছে সন্তানের আকুল আবেদন - মা তুমি আবার ত্রিশূল ধর, খড়্গ ধর , অসুর দলন করে ধরায় শান্তি আনো। মানুষ শান্তি চায়, স্বস্তি চায়। প্রেমময় জগতে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। তার মনে যে স্বার্থের কালিমা জমেছে তা দূর করে স্নিগ্ধ , শান্ত, উদার আকাশসম শুভ্র মনে নির্মল চিন্তা এনে দাও - সে যেন মানুষ হয়ে মানুষের সকল বোধ নিয়ে বাঁচতে শেখে। মায়ের কাছে এই হোক একমাত্র প্রার্থনা।

'বকলমা' - 'আমমোক্তারি' - 'শরণাগতি'

স্বামী সুপর্ণানন্দ

আমরা শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী শুনে আশ্বস্ত হই : সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
হে অর্জুন, তুমি সব জীবনের ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার স্মরণ লও। শরণাগতির প্রয়োজন এই জন্য যে তা নিলে আর কোন সাধনভজন করার দরকার নেই। আমি অসহায়, তোমার শরণাগত, তুমি দেখ আমাকে। আর আমার কোন ব্যাপারেই কর্তৃত্ব নেই ; কোন কর্তব্যবোধও নেই কোথাও। ভক্তের এই ভাব। সব ছেড়ে ভগবানকে ধরবে, তিনি মুক্ত করবেন। 'শোক করো না। ' খুব সহজবোধ্য নির্দেশ। কর্তব্যগুলিকেই এখানে 'ধর্ম' বলে বোঝানো হয়েছে। 'সব কর্তব্য ছেড়ে এস। আমি ডাকছি। তুমি তোমার কর্তব্য করতে সমর্থ, তা আমি জানি; তুমি শক্তিমান তাও জানি। তুমি উদ্যোগী তাও জানি। কর্মক্ষমতা তোমার আছে তাও জানি। তবু এই সব ভুলে গিয়ে, ছেড়ে দিয়ে আমার শরণ নাও। ' এটি নির্দেশ। আর একটি কথা: তোমাকে এইভাব আনতে হবে যে সাধন ভজনে কিছু হবে না। শুধুমাত্র এবার শরণ নিতে হবে অর্থাৎ, সব পথ ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নেওয়া তাঁর চরণে, মাস্তুলে। ভক্ত বুঝেছেন - শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বাঁচার আর আশ্রয় নেই। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তেরা সবাই শ্রীভগবানের আয়ত্তে; সবাই তাঁর অনুগত। কেউ উদ্ধত নয়। শরণাগতিতে শ্রীভগবানের এই ভাব প্রকট। আমার শরণ নাও; অন্য কারোর নয়। 'আমি' তোমাকে উদ্ধার করব। শ্রীভগবানের অনন্ত ক্ষমতার প্রকাশ পাচ্ছে, ঐশ্বর্যের প্রকাশ হচ্ছে। আর ভক্তের কাছে চাওয়া হচ্ছে দীনতা , বিনয়, নম্রতা। ভক্তের কোন কর্তৃত্বই স্বীকার করা হচ্ছে না।
যাওবা একটু কর্তৃত্ব বোধ ছিল, তাও নষ্ট করা হয়েছে। এমন ভক্তের দেখা সে যুগে পাওয়া যেত। শ্রীকৃষ্ণ পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পেতেন - নাগ মহাশয়ের মধ্যে।
কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগে এখন ভক্ত আর কই পেলেন যাকে বলবেন - শরণাগত হও। যারা সব এল তারা বেশির ভাগই তো হয় গিরিশ ঘোষ , নয় কালিপদ ঘোষ, নয় তো সুরেশ মিত্র সব। কেউবা মহেন্দ্রলাল সরকারের মত উদ্ধত। জোলো দুধ-জ্বাল দিতে গিয়ে চোখ জ্বলে গেল। ধনে, জনে, গর্বে, পাণ্ডিত্যে সব অহংকারী। দায় তো তাদের নয়। দায় যেন শ্রীভগবানের।
তাদের বলা যাবে না - শরণাগত হও। বলা যাবে না - আর কিছু না পার - দুবেলা নাম কর - একবার করে। তেড়ে-ফুঁড়ে বলবে তারা - ওসব পারবো না, মশাই। তবে 'ঘুমাবার সময় একবার নাম কর।' নয়, তাও হবে না 'কখন ঘুমাই' তার ঠিক নেই। এখানে অহংকার তো ভক্তের। শ্রীভগবানই তো ভক্তের দাপটে রীতিমতো সন্ত্রস্ত। যুগ পাল্টেছে যে। তাই, শেষে নিরুপায় হয়ে শ্রীভগবান মাধুর্যের সাগর হলেন: তবে 'বকলমা' দাও। নূতন কথা। সেজন্য ভক্ত বুঝতেও পারে না - 'বকলমা' আবার কি ? বোঝাচ্ছেন 'আমমোক্তারি' - -
দাও। 'বকলমা' যা 'আমমোক্তারি'ও তাই। তুমি যদি কাজটি করতে না পারো, নাবালক বলে, অসহায় অক্ষম বলে, তাহলে আর একজনকে ভার দিতে পারো - প্রতিনিধিরূপে। সে তোমার কাজটি করে দেবে। যেমন - নাবালকের 'অছি'। শ্রীরামকৃষ্ণের 'বকলমা'য় তাঁর মাধুর্যের দিকটি ঝরে পড়েছে। জানি না কোন বৈষ্ণব সাহিত্যে বা সাধনায় এই 'সাধনাহীনের সাধনার' কথা আছে কিনা। যে শুধু তা বললেন তা নয়, সত্যিই ভক্তদের সব ভার নিয়ে তাদের পরিত্রাণ করেছিলেন। সে সব কাহিনী আমরা জানি। যাঁরা বকলমা দিয়েছিলেন তাঁরা পরে বুঝেছিলেন এ বড় কঠিন সাধনা। পুত্র মারা গেলেও কাঁদা যাবে না; সব ভার তো অর্পণ করা হয়েছে। সে কান্নার ভারও তাঁতে অর্পিত। সুতরাং বকলমা এবং আমমোক্তারি দেওয়া. একই তত্ত্ব। দুটি শব্দই সমার্থক। আমাদের যুগে অহংকারী ভক্তের জন্য এই দাওয়াই। যে ভক্ত নিজে তো কিছু করবেই না, পরন্তু ভগবানকে গালাগালিও দেবে, তার জন্যই এই মাধুর্য প্রকাশ। আর, ওদিকে শরণাগতিরও অর্থ একই। দুটি ভক্তই শ্রীভগবানের শরণ নিচ্ছে, দুটি আলাদা অবস্থা থেকে। একজন বুঝেছে, সে ভক্ত এবং শরণাগত হয়েছে নানা ঘাট ঘুরেই। অন্যজন বুঝেছে, তাকে উদ্ধার করার দায় শ্রীভগবানেরই , তার নিজের কোন প্রয়োজনও নেই। দেখা গেল শরণাগত পরিত্রাণ পেয়ে উৎফুল্ল; আর 'বকলমী' কৃপার বহর বুঝতে পেরেছে পরে এবং তখন অশ্রুসাগরে প্লাবিত। একজন কেঁদে পেয়েছে শরণাগতি; অন্যজন 'বকলমা' পেয়ে কেঁদেছে। অবশ্য ফল একই; শ্রীচরণপ্রাপ্তি। একটিতে প্রকাশ পেয়েছে ভগবানের ঐশ্বর্য; অন্যটিতে মাধুর্য। সত্যিই তো - 'এমন দয়াল আর পাবিনে। '
শ্রীরামকৃষ্ণদেব না এলে অধ্যাত্মরাজ্যের এই নূতন সাধনভাবটির সন্ধান পেতাম না। এ জন্যেও তাঁকে অবতারবরিষ্ঠ বলতে পারি।

Sarbojonin- 'Inclusiveness, equality and sharing'

Ayon Chakraborty

Since childhood, the cultural and socio-economic background that we usually have belonged to, have always taught us one most important word, and that is 'sharing'. Share your toys with your brothers and sisters, share your home with your extended family, share your books with your friend in the school, share your tiffin, share your seat on the train and the list goes on. At times, as a person, all of us have cruised the word 'sharing' some way or the other. Since then life has taken its own course, time has passed by and here we are, with the ever- rising border tensions, climate change, and other differences, the whole world has started to learn that to sustain as a human race, the most important word in the future will probably be 'Sharing'. As a reader your mind might be questioning, how can an Introduction of a Puja be like this. In Bengali language the word Sarbojonin means something that is for all (sobar jonno), do you realize the thinking behind Sarbojonin , yes reader, it is sharing!

Today, let's hear the story of sharing and beyond. In 2013, a group of like-minded people thought to start a Durga Puja that will be celebrated amongst all, irrespective of cultural background, racial differences and religious upbringing. A puja that anyone and everyone can join and be an integral part of. A puja to share with all, a puja for all, a 'Sarbojonin' Puja. To begin with, a small hall in the south of Stockholm was booked, but Maa Durga had her own plans, due to huge number of visitors, within couple of years the puja had to move in a bigger place in the northern part of the city. Day by day, year by year the sharing of the puja has gone beyond and just within five years since the puja was started, it has become the largest Durga puja of Nordics. Even the coming generation started getting involved and got ready to carry the baton forward. Since last couple of years every year we had around 2000-2500 visitors in the whole event. In a country of 9 million people, an event with non-European origin receiving 2000-2500 visitors only happens when people think that this is their event, and truly it is a people's event. In western countries all these kinds of initiatives come under a name bracket 'event'.

Now what makes this puja so special. This puja is Sarbojonin or 'Sobar Jonno' (for all), which also makes it a puja by all, and of course it comes with practicality of operating costs of the event, logistics and so on. And which is solved by going back to the basic philosophy of sharing. The most simple yet the most powerful tool ever. By the grace of the Holy mother the amount of donations from the committee members and visiting guests are helping us to sustain this huge initiative. Unlike many other events, there is no entry fee or subscription as such. All visiting guests are served free of cost lunch and dinner. As we celebrate the advent of Mother, and one should not have to pay while eating in mother's house. Usually we serve pure Bengali vegetarian food including finger licking Khichuri, labra that brings nostalgic memories, tongue twisting chatni and of course the misti which is synonyms of a whole race, namely bengalis. To organize the operations smoother and due to the fact that we need to abide by the hall capacity a coupon system has been implemented since couple of years. The Embassy of India and the Embassy of Bangladesh have actively supported our puja in previous years. Same as Durga ma, who believes in inclusiveness , holding her family strong and tight, we also believe in inclusiveness. The fund that we raise for this event, we share a little part of it with them, who needs it most. A part of our funds goes to some NGO activities in India. We work with NGOs like Little Big Help, Aspire and Glee etc. Some of the activities included buying Pujor Jama (new clothes) for some street children, arranging a Puja tour for them and so on. Usually these events are organized by the NGOs even before our pujo starts in Stockholm, which makes it more special for us. Usually we celebrate the puja during the weekend, we try our best to be in line with the actual dates. And we celebrate it for three days. During

the three days of Puja artists from Sweden and from other countries perform in our scintillating cultural programs. Our stage has witnessed Swedish people playing table and dhak, and Bengali kids reciting Swedish poems, defining the perfect positive integration. Sharing the cultures makes the world borderless, and today's mahisauras of world can be defeated only buy this unity , integration and sharing. The cultural programs are always designed with fusion of Indian , Bengali and Swedish culture, and as well as to promote the unique traditions that our Bengali culture have. 500 audience of the cultural program often experience different Indian dance forms , Bengali cultural richness, drama, recitations , percussions and what not. Mozart to Tagore, Volga to Ganga we have it all. In previous years we have celebrated 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore
and 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi in our cultural programs. We also arrange many kids activities throughout the puja days. Well, even if we cannot bring the kids the parar pujo (Puja of the society) feeling with the cap-bondhuk (toy guns) we try to provide them the ambience that will keep them rooted and thus in future they will carry this legacy forward. With cultural programs, food and togetherness another thing has been very attached to Durga Puja since its inception probably. Back in home, during the autumn half yearly exams, we all have hidden suktara or anandamela in our bookshelf behind the boring biology or geography books. Yes, puja is incomplete without a pujabarshiki (yearly puja magazine). Every year SSPC publishes a Puja Barshiki, which is very unique in Sweden. The name of our puja barshiki is likhon. Until now Likhon is the only Bengali Puja barshiki published in the northern Europe.

Now coming to the heart of it. Nowadays the word B2B is very popular if you are corporate. But during Durga Puja B2B has a completely different meaning, and that is 'Bodhon 2 Bisorjon'. The worship of the divine mother brings in a blissful atmosphere in the venue. The bodhon with 'Dhaker baddi', the 'chokhudan' and 'pran prothistha', 'asthamir pushpanjali', 'shandhi-pujo', 'sindoor khela', 'mayer bisorjon' even a poor believer like myself gets Goosebumps. And very similar to our childhood feeling when the Dashami brings the curtain down for the durga puja, we all start counting the days for the next year with a low mood. But again, the bijoyar kolakali (traditional hugs on Dashami) helps to share the sorrow and lessen it a bit. And here you see, we have come back to where we started, 'sharing'.

As an integral part of the SSPC, I get this question a lot from my friends and visitors, ' How do you manage to run this huge initiative in a foreign land which is almost close to the north pole' , I usually smile back and answer 'by sharing'.

Mark Twain, The American author once wrote some nice lines about undivided India: *"India is, the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only."* I believe , of that holy ocean , SSPC is just another small rivulet that is flowing in a foreign land.

photo courtesy : sspc facebook page

BELIEVE – PRAY - REPEAT

Akshi Gaur Agrawal

A new story began when the train stopped at a lonely station in Sweden on a Sunday evening. One could gaze around for as long as their sight could, but there were no signs of life around. It was akin to being deserted! This is my story. I moved to Sweden in 2017 with my family, 4 big suitcases, some jitters and lots of new hopes. Little did I know about the 'how's and 'when's of my new journey but I had my constant and countless prayers that kept the momentum going. From good to bad, certain to uncertain, known to unknown – in every phase of this new story I always looked back to the index, which only read – Pray!

As days progressed, many chapters of the new tale unfolded; I smiled on many and cried on some! It wasn't easy adjusting to a new culture, language, country and job and with every passing minute, my faith in the Almighty leaped by many bounds. It has been more than two and a half years and my relationship with him has only grown stronger.

Ma Durga, who is synonymous to strength has always been at my rescue. Her fiery eyes make me believe that if I am virtuous, nothing can wither my self-esteem. Her invisible third eye appears like wisdom and knowledge – hidden, yet powerful enough to destroy the evil-minded demons. The 'Bindi' on her forehead brings out the woman in me. It teaches me that no matter where I am or what I do, I am a home maker first. The nose ring inspires me to keep my values intact and untouched by (sometimes) the disruptive world. Her face is a symbol of immense confidence. Her many arms are nothing but a representation of strength, determination, independence, fearlessness, morality, empathy, humanity, power and spirituality. The Lion to me is the base of life. It tells me how proud I should be to be a woman; someone or rather the only one that has the vigour and power to bring new lives into this world. Ma Durga, who stands for both destruction and creation, symbolises that the end of something is not necessarily a bad thing. It also signals new beginnings and regeneration. Like it did in my case! My new story was an end to something beautiful and a beginning of something better. I only had to have faith and belief!

There is no denying that Sweden has given me a lot of positive experiences in life. What is also true is that this country brought out the devotee in me. My belief in prayers had never been that strong. There is something enigmatic about prayers. They bring a motive to life, they communicate with you silently. They work wonders and the best part about them is that the more your pray, the better your days become. I do not know what spirituality means. I have always had difficulty in understanding its dictionary meaning. What I know for sure is that being involved with the Almighty, with Ma Durga, has brushed a side of me that I wasn't much aware of. Thinking of it deeply, I think it will be fair to call it spirituality!

One must wonder the reason behind my emphasis on prayers. In all veracity, I endorse praying as much as I endorse being open minded. Praying doesn't coop me in religious norms and being open minded doesn't drift me away from God. It's very common to mix these two meanings and it's sad to see how some people either give up beliefs in order to 'appear' open minded or spend all their life captivated in traditions that they don't understand. I pray for my family, for the wellbeing of my loved ones. I also pray for a better world so that my daughter or our future generations can live a good life. I pray for the animals and our natural resources. I just pray and find reasons later. I feel a balanced mind-set when I dedicate sometime of my day to the Almighty. I see stable reactions coming out from me ever since I

started praying regularly. I connect with the cosmos more spiritually than ever before. I have learned the art of letting go and the courage to accept things as they are. Prayers have changed me into a more understanding human being. Something positive has gone inside my intellectual wiring and nothing worries me now. I pray to Ma Durga when I am happy and I pray on my blue days!

On this Navratri, I pray that Ma Durga brightens your life with wisdom and strength. I pray that we all pray for a beautiful tomorrow. There is no bigger asset than Praying. Pray more stress less. Sometimes, all it takes is just one prayer to change everything. After all, when prayers go up, blessings come down!

Happy Navratri.

Suchetana chakraborty

Ma Durga

Amanita Sen

First, she failed me
by doing nothing
about the Annual
exams grades and
that despite the
closed-eyes Anjali!

And when I half-hoped
her Third Eye (being the extra)
will lend its sight to
the neighbor's son
who was born blind,
she failed me miserably.

All the year round, newspapers
screaming of female-pain,
reeking of blood from infant to old,
and justice still a far cry,
Her gender-patronage is not to put
my money on, lessons learnt!

Yet I fold in two wishes, one,
the glimmer in the child's
eyes stay alive of novelties
these Shiuly-times offer!
Two, I risk your sarcastic smirk,
the razzmatazz find a meaning,
deeper!

THE INCREDIBLE WORLD CUP FINAL FINISH

Ritesh Bhattacharya

Was it all just a dream? Up throughout the day on 14th July '19, I join cricket fans in disbelief all over the world after what was one of the most incredible games of cricket in history. Forget just ODIs. One of the best games in history.

England a.k.a Poms (prisoners of her majesty) won their first ever World Cup, denying the luckless **New Zealand a.k.a Black Caps** in a heartbreak that no Bollywood movie can ever top. 'Big Ben' Stokes played the innings of his life to rescue his side, along with events late on that day surely must have the ICC questioning their rules.

However, whatever your views of the rules, no one can deny the sheer drama that had fans on the edge of their seat. The 1999 World Cup Final is the earliest I can remember, which was incredibly one-sided. So were 2003 and 2007. Sri Lanka did well in 2011, but India won with time to spare. 2015 was also one-sided. But, the 2019 World Cup Final made up for it all, producing the kind of drama that tells you that a fours and sixes aren't the essential requirement for a great game (well, that's ironic given that Poms actually won on boundaries ☹).

So, after all that, here are a few points from an incredible World Cup Final.

The greatest ODI of all time

The 2019 Cricket World Cup Final will go down as the greatest ODI of all time. 20 years on from the 99 semi-finals, this Final trumped it in terms of sheer drama, turning points, controversy and the incredible Super Over.

Black Caps, like they did against India, believed they were in the game at half time. They had runs on the board in a Final. But, what was more impressive this time was their ability to stick to their task after a luckless first few overs, ripping through Poms in the middle to leave Ben Stokes and Jos Buttler with a mountain to climb. The duo put on a magnificent stand, but a game like this was never going to have a tame end. Indeed, the ending was so good that Abbas Mastan (director duo known for stylish suspense movies) would not have been able to script such drama.

‘Big Ben’ Stokes

Stoke’s knocks against Sri Lanka and Australia were signs of a player confident in his ability to bat through storms. In the finals, he went up to another level, keeping his cool as Pom’s batting lineup was under attack from Black Cap’s armoury of talented bowlers. He gave himself a chance to get his side home even when he could barely run anymore.

It was a performance for the ages. Sheer adrenaline and passion got him over the line. Every ounce of energy was spent in creating history. Now, Stokes can be mentioned in a list of players who produced gold in World Cup Finals – a list that includes Clive Lloyd, Wasim Akram, Aravinda de Silva, Ricky Ponting, Adam Gilchrist and MS Dhoni.

Reflection on rules

ODI Cricket’s showpiece event was a magnificent spectacle. However, two rules left a sour taste.

The first was in the last over of the chase. Poms needed nine runs off three balls, and Ben Stokes hit the ball out to deep midwicket and rushed back for two. In a game full of drama, it was only appropriate that the throw would cannon off his bat as he dived to make the crease and run away for four. Two turned into six, but this should have never been the case. It should have been five instead of six, but that’s all extra complication. Batsmen don’t run for overthrows when the ball hits them, so why should four runs count? Why should the fielding team be penalized for trying to initiate a dismissal that accidentally hits the batsman? That too in the final stages of World Cup Final? Cricket has some incredible rules that defy logic, and this is one of them. It is time for the ball to be dead if it accidentally strikes the batsman running between the wickets.

The second is the boundary rule. Black Caps watched Poms lift the trophy without even losing the match. By rewarding the number of boundaries across the game, you disregard the effort put in by players in running between the wickets. If teams finish with equal runs, then you have another Super Over. The team with more runs should win the match. After all, a boundary is equivalent to four singles. So, why should the boundary mean more?

Yes, both teams knew the rules beforehand. But, that doesn’t make them good rules. New Zealand were very hard done by, and how they and their fans would be feeling right now is something you wouldn’t wish on anyone. This is in addition to **Kumar Dharmasena** and **Marais Erasmus** making errors, including the missed edge off Kane Williamson, incorrect LBWs off Henry Nicholls and Ross Taylor (which he couldn’t review) and the very good shout turned down against Jason Roy on the first ball of Poms’ innings.

Things could have been better in such a big game.

Bowler’s World Cup

Hey, who remembers Liam Plunkett taking 3/42 in a magnificent spell that turned the game in the middle overs? So much happened after Plunkett’s exploits, but it was such great justification for Poms’ selectors.

Poms have been home to big totals over the past four years. Beautiful batting pitches have been the common theme, making games a boundary-a-thon rather than a proper battle between bat and ball. In the Final, we were treated to an amazing battle, where the likes of Plunkett, Chris Woakes, Lockie Ferguson and Colin de Grandhomme proving that you don’t need 350 vs 350 to have a thrilling ODI match.

Indeed, it was a magnificent effort by Black Caps to come so close. Their batting never fired all tournament, but their bowlers always kept them in matches. As the saying goes, batsmen win you games, but bowlers win you tournaments, and Poms' improvement with the ball also played a crucial factor in their success.

Hard work pays off

Despite the controversies, no one can doubt Poms have been the best side over the past four years. Their embarrassing campaign in 2015 was the catalyst for change, embarking on a four-year journey that ultimately had the perfect destination.

Eoin Morgan deserves plenty of credit. He and Trevor Bayliss instilled a culture of freedom in their ODI side, completely changing their approach to white-ball cricket. They had bumps along the way – such as the 2017 Champions Trophy Semi Final – but they held their nerve here even as they weren't even assured of a Semi Final spot with two group games left to play.

Finally, Congrats England hopefully this makes up for Brexit ! 😊

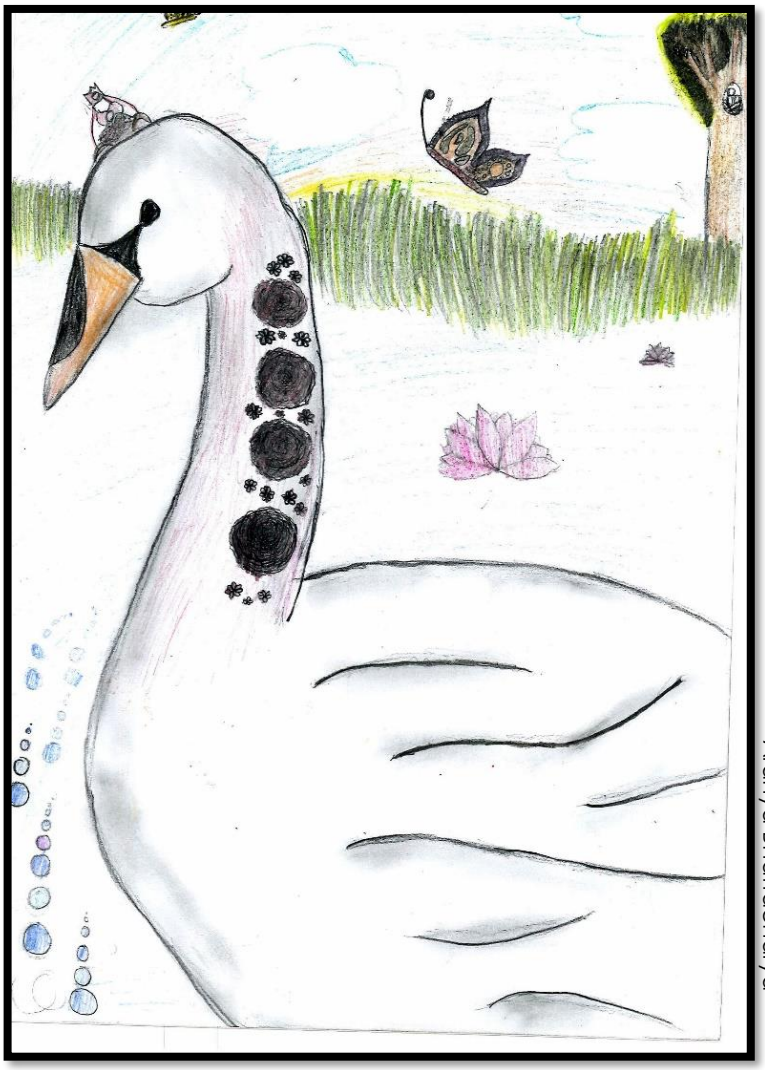

Aranya Bhattacharya

চাঁদে ভ্রমণ - এখন কোন অলীক কল্পনা নয়

অরুণিমা ব্যানার্জী

আমাদের দেশে শৈশবে শিশু মায়ের কোলে উঠে কোন এক কুটিরের মাটির দাওয়ায় বসে চাঁদনী রাতে চাঁদের পানে চেয়ে থাকে আর তার মা চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে ডেকে বলে - আয় চাঁদ আয়, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। শিশু অবাক হয়ে সেই চাঁদ দেখে। তার ভাব প্রকাশের ভাষা সে জানে না। কিন্তু তার শিশুমনের কল্পনা চাঁদের পানে ধেয়ে চলে। তার কাছে চাঁদ আর কোন দূরের বস্তু নয়, একান্তই চাঁদ মামা। শিশু চাঁদের নৈকট্য অনুভব করে। সে মনে মনে ভাবে, একদিন বড় হয়ে সে চাঁদের দেশে যাবে, সকল রহস্য উদঘাটন করবে। শিশুমনে এই যে কল্পনা, এই কল্পনাই মানুষকে একদিন চাঁদে যাবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। বাঁধভাঙ্গা চাঁদের হাসি যখন ধরার বুকে উছলে পড়ে তখন কবির কাব্য আসে; গীতিকার গান বাঁধেন; বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ চাঁদের বুকে পা রেখে সকল রহস্য ভেদ করতে চায়। মর্তবাসীর কাছে চাঁদ একান্তই আনন্দের উৎস। এমন কোন রোমান্টিক কল্পনা নেই যেখানে চাঁদের শুভ্র জোছনা অনুপস্থিত। শরতের শুক্লপক্ষের নির্মল আকাশে চাঁদ যখন পৃথিবীর কাছে আসে আর তার আলোয় পৃথিবী ঝলমল করে, তখন কল্পনাবিলাসী মন তার কল্পনার ডানায় চড়ে চাঁদে পাড়ি দেয়। যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে মায়াবী জোছনা রাতের প্রভাব সমান ক্রিয়াশীল।

পাখির ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাওয়া দেখে মানুষ একদিন আকাশে উড়ে যাবার কল্পনা করেছিল; সেই কল্পনাই উড়োজাহাজ তৈরি করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়। যে শিশুমনে চাঁদের জোছনা বিস্ময় জাগিয়েছিল, সেই শিশুই পরিণত বয়সে চাঁদে যাবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু এ কাজ বড় কঠিন। কিন্তু অজানাকে জানবার, দেখবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। সে চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী। মহাকাশের চাঁদ, তারকা চিরকাল মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তারা যেন মানুষের সঙ্গে মিতালি স্থাপনে আগ্রহী। মানুষ অবাক নয়নে চেয়ে থেকেছে, কাছে যাবার বার্তা কে তার কাছে পৌঁছে দেবে ভেবে পায়নি। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ মহাকাশের যবনিকা উন্মোচনের চেষ্টা করেছে। গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রভৃতি মনীষীর অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কার মানুষের মনে কৌতুহল জাগিয়েছে। Jules Verne, Edgar Allan poe, H. G. Wells প্রমুখের রচনায় মানুষের সেই সুদূরের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে আরো উদ্দীপিত। অসংখ্য পণ্ডিতের শ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলে আজ দূরের চাঁদ ঘরের বাতায়ন প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে এমন মহাকাশযান আবিষ্কার করতে হবে যার গতিবেগ হবে প্রচন্ড - যে গতিতে ছুটে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে যেতে পারবে। মানুষের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হলো প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন মহাকাশযান তৈরির পিছনে। আবিষ্কার হলো রকেট। প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলা রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ ও গতিবেগ আরও উন্নত করার কলাকৌশল মানুষের আয়ত্বে এলো। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হলো।

১৯৫৭ সালে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায়। শুরু হলো মহাকাশের রহস্য উদঘাটন। ১৯৬১ সালে রাশিয়ার মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মহাকাশ পরিক্রমা করেন , মহাকাশের যবনিকা উত্তোলন করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। একে একে বিভিন্ন দেশ মহাকাশে উপগ্রহ পাঠানো আরম্ভ করে। সেইসব উপগ্রহে মানুষও মহাকাশে পাড়ি দেয়। মহাশূন্যে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে তারা নানা তথ্য সংগ্রহ করে। তাদের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য পরবর্তীকালে চাঁদের অভিযাত্রীদের বিশেষ উপকারে লাগে।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এর বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার; নক্ষত্রের বর্ণালীর বিশ্লেষণে অধ্যাপক মেঘনাথ সাহার সাফল্য; অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্ব-জাগতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। মেঘনাথ সাহা আবিষ্কৃত theory of interplannetray motion & thermodynamics এবং এর উপর তার তত্ত্ব সারা বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। পরবর্তীকালে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চায় ডঃ হোমি ভাবা এবং বিক্রম সারাভাই এর অবদান অনস্বীকার্য।

ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশ পরিক্রমার প্রায় দশ বছর পরে 1969 সালে প্রথম মানুষ চাঁদে অবতরণ করে। অভিযানকারী রকেটটির নাম Apollo 11। ওই যানে তিনজন মহাকাশচারী ছিলেন। নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। এরা সবাই আমেরিকার অধিবাসী। উপগ্রহটি চাঁদের কক্ষপথে কয়েকবার পরিক্রমা করে, তারপর উপগ্রহের শেষ অংশ যাকে বলা হয় Eagle Module - সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সেই Eagle Module চাঁদের মাটি স্পর্শ করে। 1969 সালের 20 শে জুলাই, দিনের শেষ প্রহরের সেই মহেন্দ্রক্ষণটি মহাকাশ

বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রথমে নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের বুকে পা রাখেন, তারপর অলড্রিন নেমে আসেন। তারা সেই অভিযানের অসংখ্য ছবি পাঠায়। সেখানে দেখা যায় চাঁদের ভূমি সমতল নয়। অসংখ্য অতলস্পর্শী গহ্বর এবং আগ্নেয়গিরির মুখ (pits craters), প্রচুর পোকমার্কস।তারা প্রায় আড়াই ঘণ্টা চাঁদের উপর অবস্থান করে নানা পরীক্ষা চালান তারপর প্রায় 22 কেজি moon rock সংগ্রহ করেন। সর্বশেষে পুনরায় সেই Module এ চেপে চাঁদের পৃষ্ঠ ত্যাগ করে চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমারত command মডিউলে, যেখানে মাইকেল কলিন্স বসে ছিলেন - তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং প্রচন্ড গতিবেগে চাঁদের কক্ষপথ পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারপর একদিন রাতের শেষে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলে অবতরণ করেন। পৃথিবীর মানুষ টিভির পর্দায় সকল প্রত্যক্ষ করে আর হতবাক হয়ে যায়। আর ঠাকুমা দিদিমারা চাঁদের বুড়ির ঠিকানা না পেয়ে হতাশ হয়।

1970 সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অসংখ্য মনুষ্যবিহীন উপগ্রহ মহাশুন্যে পাঠায়। পরে সেইসব উপগ্রহে মানুষও মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। তারা দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, তারপর সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে আসে। শুধুমাত্র চাঁদে নয়, মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে। কি এক আকর্ষণে মানুষ বারে বারে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে, আশা - হয়তবা কোথাও প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে।

মহাকাশ গবেষণায় ভারত ও পিছিয়ে নেই। মেঘনাথ সাহার অবর্তমানে হোমি ভাবা, বিক্রম সারাভাইয়ের নেতৃত্বে অসংখ্য বিজ্ঞানীর চেষ্টায় বারেবারে মহাশূন্যে নানা উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে। কখনো 'আর্য ভট্ট', কখনো 'ভাস্কর', কখনো বা 'রোহিনী' নামে সেসব উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে। তারা সাফল্যের সঙ্গে নানা গবেষণা চালিয়েছে এবং নানা তথ্য সরবরাহ করেছে। সম্প্রতি মহাকাশযান চন্দ্রযান পাঠানো হয়েছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় টেকনলজি ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এই মহাকাশযান পাঠানো হয়। সারা পৃথিবীতে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠাচ্ছেন এবং অনবরত গবেষণা চলছে। এমন একদিন আসবে যখন চাঁদে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। এখন যেমন মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ভ্রমণে যায় তেমনি একদিন মানুষ চাঁদেও ভ্রমণে যাবে এবং চাঁদের বুকে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করবে।

Aranya Bhattacharya

সন্ধের ডানা

সোমদত্তা

সকাল থেকে একটা গন্ধ নাকে ঘুরঘুর করে চলেছে, হালকা, ফুটফুটে, দুষ্টু-মাখা গন্ধ; কিন্তু কিসের যে সেই গন্ধ টা কিছুতেই মনে পড়ছে না অপরাজিতার! আজকাল মস্তিষ্কের লুকোচুরি খেলাটা যেন একটু বেড়েছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ছুঁইছুঁই অপরাজিতার। একপিঠ চুলে এখনো 'অপা' যথেষ্ট সুন্দরী। যদিও ঘন চুলে এখন রুপোলী ঝিলিক, কিন্তু তাতে যেন সে আরো বেশি সুন্দরী। হাসব্যান্ডের অবশ্য অনেক বার বলা হয়ে গেছে, "কালার করে হাইলাইট করো খুব সুন্দর লাগবে।" কিন্তু কেন জানি বাহ্যিক সৌন্দর্যটা মোটে ওকে টানে না।
বিকেলটা যখন গোধূলির হাত ধরে সন্ধ্যার বুকে ঢলে পড়ে সেই সময়টা অপরাজিতার ভারী পছন্দের। ঘরের আলো একটু দেরিতেই জ্বালে সে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝলমলে শহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় আজকে তো অঙ্কুশ তাড়াতাড়ি ফিরবে। দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা বসাতে বাসাতেই কলিং বেল।
ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন "কালো সার্টটা বের করে রেখেছে তো, আর তার সাথে লাইট গ্রে কালারের প্যান্টটা। কি হল তাড়াতাড়ি চা টা দাও। আজকের বিজনেস ডিনারটা খুব ইম্পরট্যান্ট।" তাড়াতাড়ি স্নান করে তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে অঙ্কুশ। ততক্ষণে অপরাজিতার অমলেট আর চা রেডি।
বড় একটা অমলেটের টুকরো মুখে পুরতে যাবে, অপরাজিতার চিৎকার "আরে আস্তে আস্তে, গরম, জিব পুড়ে যাবে যে"।
“আস্তে যে খাব তার কি সময় আছে। এই বিজনেস ওয়ার্ল্ডে টাইম ইজ মানি। তুমি আর কি বুঝবে অপারানি।" বলেই বউয়ের গালে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে চলে গেল অঙ্কুশ রেডি হতে।
তা অবশ্য ঠিক, বিজনেস আর অপা, একটা উত্তর তো আরেকটা দক্ষিণ মেরু। একবার নিজের কিছু করার তাড়নায় কোমর বেঁধে শাড়ির বিজনেসে নেমেছিল বটে। সুন্দর সুন্দর শাড়িও তুলেছিল। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব বেছে বুছে শাড়ি নিয়ে গেল। কিন্তু গোল বাঁধল পেমেন্টের সময়। কেউ বলে আজ দেবো, কেউ বলে কাল দেব। এ মাসটা একটু অসুবিধে ভাই, সামনের মাসে দিয়ে দেব। লোকের কাছে গিয়ে তাগাদা দিতেও অপরাজিতার কেমন যেন বাধে। নিজেকে কাবলিওয়ালা কাবলিওয়ালা মনে হয়। মোদ্দা কথা অঙ্কুশের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি ঘটিয়ে শাড়ীর ব্যবসাকে প্রণাম জানিয়েছিল অপা। ব্যবসার দিকটা আর কোনদিন মাড়ায়নি সে।
"কই গো তাড়াতাড়ি নটটা বাধবে তো..."।
"আসছি" রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় অপা।
"এত বছর হয়ে গেল তবু নট বাঁধতে শিখলে না! কই দেখি।"
মুখে যাই বলুক এইযে টাইয়ের নটটা অঙ্কুশ বাঁধতে পারেনা এটা কিন্তু অপার ভারি ভালো লাগে। অনেক কিছুর মধ্যে এই টাইয়ের নটটা একটা বিশেষ নট, যেটা অপা আর অঙ্কুশকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে।
"শোনো ফিরতে রাত হবে। এন্ড আই হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক টুডে। সো প্লীজ ডোন্ট বি ড্রামাটিক, আফটার আই কাম ব্যাক"।
কপালে একটা ছোট্ট চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল অঙ্কুশ।
লিফটের সামনে থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল "কিডস আর ওকে?”

হ্যাঁ সব ঠিক আছে তুমি সাবধানে এসো।
বলতে বলতেই টেলিফোন, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে চিৎকার।
"মা দাভাই আবার চিনি খাচ্ছে মাখন দিয়ে" ঠাম্মুকে বারণ করেছি দিতে, কিন্তু শুনছে না...।"
"ঠিক আছে আমি তোর ঠাম্মুর সাথে কথা বলছি, আচ্ছা আগে বল তুমি কেমন আছো? দাদুন ঠাম্মুকে জ্বালাচ্ছ না তো?"
"নো আই এম ফাইন" নাও টক টু ঠাম্মু-----
"কেমন আছো মা? ওরা তোমার কথা শুনছে তো?"
"হ্যাঁ--! তোমার ছেলেমেয়ে তো কথা শুনে উল্টে দিচ্ছে! সেই বিকেল থেকে তোর মেয়েকে বলছি আয় চুলটা একটু আঁচড়ে বেঁধে দি। সে কে কার কথা শোনে। সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।"

আর বলতে গেলেই হুমকি দেয় "দেখ আমি কিন্তু বাড়ি চলে যাব। আর আসব না। এন্ড ডোন্ট টাচ মাই হেয়ার ঠাম্মু, আই ডোন্ট লাইক ইট।"
"আহা কে তোর লাইকের ধার ধারে রে। হ্যাঁরে অপা মেয়ের চুলটাকে একটু যত্ন করতে পারিস না? ক্লোরিনে তো চুলগুলো ছারখার হয়ে যাচ্ছে- সেই বিকেল থেকে ঘড়ি দেখে চলেছে কখন সাতটা বাজবে আর দাদুকে নিয়ে সাঁতারে যাবে। মেয়েটা একদম আমার মত হলো রে মা- এক্কেবারে ডানপিটে। ছোটবেলায় আমি তরতর করে নারকেল গাছে উঠে যেতাম আর আমার ভোলারাম দাদা আর ভাইগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো।এক নিঃশ্বাসে পুকুরের এপার থেকে ওপার। কেউ কোনদিন হারাতে পারেনি। আর ঘুড়ি ওড়ানোতে তো নাম্বার ওয়ান। পাড়ার সবার ঘুড়ি ভোকাট্টা। শিউলিটা পুরো আমার ধাত পেয়েছে রে অপা।"
"সত্যি মা তুমি আর তোমার শিউলি পারোও বটে। আর শরৎ, শরৎ কি করছে?"
"ও আমার দাদুভাই সে তো আমার লক্ষ্মী সোনা ছেলে। সকাল থেকে বই নিয়ে রয়েছে। জানিস অপা বিকেলের দিকে একটু মাখন আর চিনি দিচ্ছি লুকিয়ে লুকিয়ে।
অমনি কোত্থেকে ডাকাতটা টের পেয়ে কি চিৎকার। "আমি এক্ষুনি মাকে ফোন করছি দাঁড়াও।" বলেই, অমনি বাটিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলল।
আমি তখন ডেঁটে বললাম, "দাঁড়া এবার আমিই মাকে ফোন করে বলছি কে মাখন চিনি খেয়েছে। আমার দাদুভাইয়ের তো ওইটুকু বয়স, এখন থেকেই মিষ্টি নিয়ে এত কড়াকড়ি করিস কেন"?
"আসলে কি জানো তো মা, আমি এই পঁয়তাল্লিশ এ পড়বো। এরইমধ্যে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। তাই, ওদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু বেশি নজর রাখি। যাইহোক তুমি আজ তোমার ওষুধগুলো খেয়েছ তো? নাকি ওদের দৌরাত্ম্যে সব ভুলে গেছো?"
"নারে বাবা তুমি থাকতে আমার ওষুধ ভোলার উপায় আছে মা জননী। নে বাবার সাথে কথা বলে নে। ওই মেয়ে আবার চেঁচাচ্ছে এগরোল খাবে বলে। আচ্ছা বলতো এখন কেউ রোল খায়? একটু পরেই তো সাঁতারে যাবে। দাঁড়া দেখি।"

"কিগো মা ছেলেমেয়ের জন্য মন খারাপ করছে?"
"মোটেই না। তুমি ভাবো বাবা, গোটা একটা দিন শুধু আমার! আমি তো ভাবতেই পারিনা।"
"সেই সেই, তা বাবুন ফিরেছে?"
"হ্যাঁগো ফিরেছে। কিন্তু ওর একটা ডিনার মিটিং আছে। তো আমি এবার এক গ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে বারান্দায় বসবো"।
"গুড। গুড। মাঝে মাঝে রিল্যাক্সেশনের বড় দরকার। ঠিক আছে অপা এবার রাখি। ভালো থাকিস মা।"
"তোমরাও ভালো থেকো বাবা। আর ওদের ফেরার প্লান কবে?"
"স্কুলের তো ছুটি। থাক না দু'দিন আমাদের কাছে। পরে দিয়ে আসবখন।"
"ঠিক আছে" বলে ফোন রাখল অপা।

ফোনটা রাখতেই শরৎ শিউলির মুখটা ভেসে উঠল। শরতের হাত ধরেই প্রথম মা হওয়া অপার। মাতৃত্বের রূপ, রস, গন্ধ একটা নরম আকাশী রংয়ের তোয়ালে জড়িয়ে নার্স এসে অপার হাতে দিয়েছিল। সেই মুহূর্তটা যে কি তা বলে বোঝানোর ক্ষমতা অপার নেই। তারপর এলো শিউলি। সে অবশ্য দামামা বাজাতে বাজাতে পৃথিবীকে হাই বলেছিল। প্রিম্যাচিউর ডেলিভারি। বেশ কিছুদিন প্রিন্যাটাল কেয়ারে ছিল। আর এখন দেখো। দুষ্টুমির শেষ নেই। সর্বক্ষণ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের মনে নিজেই হেসে ফেলল অপা। অঙ্কুশের অফিস রুম থেকে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ল অপরাজিতা। তবে বারান্দায় নয় ডাইনিং টেবিলে। কিছু একটা লিখতে হবে আজ। কতদিন হয়ে গেল কলম ধরা হয়নি তাই তো বলি এতদিন মন কথা কেন কয়নি। কিন্তু লেখা কি এত সোজা? মাথা ভর্তি চিন্তা আছে বটে কিন্তু তাকে কাগজে নামায় কার সাধ্যি। গঙ্গা ফড়িং এর মত লাফিয়ে লাফিয়ে একবার চলে যায় রান্নাঘরে, তো একবার যায় বেডরুমে। সবথেকে মজা লাগে যখন চিন্তাগুলো বারান্দা ডিঙিয়ে লাফ কেটে সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে চলে যায় অপার নাগালের বাইরে। কতদিন সকালে অপা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের না লেখা লেখাদের দেখতে পেয়েছে। নিজের ভাবনাগুলো মেঘ হয়ে ভেসে বেড়ায় অপার নীল আকাশে। আগে কিন্তু এমনটা হত না। কলম কাগজ ছুঁলেই, ভাবনা ফুটে উঠত নীল অক্ষরের অবয়বে। দুধ সাদা কাগজে কলমের চলত রেশমের মতো।

কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। এই ছিল অপার প্রথম প্রেমপত্রের প্রথম লাইন। লিখেছিল অরুণাভকে। টল, ফেয়ার, হ্যান্ডসাম অরুণাভ। ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করছে। অপা তখন সদ্য স্কুল পাশ করা। বয়সের দূরত্বটা অবশ্য একটু বেশি। কিন্তু তাতে কি? টান কি আর বয়স মেনে আসে। যদিও তখন ছিল শরৎকাল। কিন্তু অপার মনে ভরা ফাগুন। বাইরে শরতের হালকা ঠাণ্ডা আমেজ। দুপুরবেলা পোস্তো ভাত খেয়ে, পিঠে বালিশ দিয়ে, রোদে পা ছড়িয়ে বসে রেডিও শুনছিল অপা। হঠাৎ একটা ফোন। হাসিতে ভরে গেল অপার মুখটা।
ফোনটা মুখের কাছে এনে হ্যালো বলল অপা। ওপাশ থেকে ভেসে এলো "কি করছ?"
"কিছু না"।
"এই 'কিছু না' সময়কে অপচয় না করে আমার কথাও তো একটু ভাবতে পারো"
"ভাবছিলামই তো। তোমার শক্ত হাতটা ধরে রেডিওর মায়া জগতে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু সে কথা কি মুখে বলা যায়।
কিছুক্ষণের নীরবতা তারপর অরুণাভ বলল "রেডি হয়ে ঝটপট বাস স্ট্যান্ডে চলে এসো। আমি ওখানেই আসছি।"
"কোথায় যাব?"
"হারিয়ে। হারিয়ে যাব তোমায় নিয়ে" থার্টি মিনিটস। ওকে বাই।"

ফোনটা রেখে আনন্দে পাগল হয়ে যায় অপা। অরুণাভ এই কথাগুলো ওকে যে কোন দুনিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার হদিশ অপার কাছেও নেই। শ্যাম্পু করা ফুরফুরে চুলে একটু হেয়ার সিরাম লাগিয়ে নেয় অপা। তারপর খুব যত্ন করে চুলটা আঁচড়ায়। একটা হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ পড়ে কপালে একটা ছোট্ট মেরুন রঙের টিপ, চোখে কাজল আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হয় অপরাজিতা। ওই তো, ওই তো অরুণাভ। দূর থেকে দেখতে পায় অপা। কালো জিন্স আর স্কাই কালারের টিশার্টের বেশ লাগছে। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে অরুণাভ বলে "এত সাজ কার জন্য?"
"কই আর সেজেছি? ঘুরতে যাচ্ছি, এইটুকু না করলে হয়। ওরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে বইমেলার দিকে রওনা হয়। এই বইমেলাটা খুব পছন্দের জায়গা। বইয়ের গন্ধে ম্ ম্ করে সারাটা ময়দান।
পারুল প্রকাশনীর দিকে এগিয়ে যায় ওরা। সমরেশ বসুর একটা বই নিয়ে পাতা উল্টায় অপরাজিতা। দেখি কি দেখছ ? অরুণাভর হাত ছুঁয়ে যায় অপার হাতে। সেই ক্ষণে ওর মনে হয়েছিল পুরো অস্তিত্বটাই যেন এই হাতটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বাকি সন্ধ্যেটা প্রজাপতির মতো কেটেছিল। ফুচকা, আইসক্রিমের এত স্বাদ অপা আর কোনদিনই পায়নি।

অপার এই ঝকঝকে সুন্দর নীল আকাশ একদিন ছেয়ে গেল কালো মেঘে। বজ্রের ভ্রূকুটি অপাকে নামিয়ে আনল রুক্ষ বাস্তবে। এক সমুদ্র স্বপ্ন ঝমঝমিয়ে ঝরে গেল বৃষ্টির ঘনঘটায়।
অপরাজিতা আর অরুণাভের সম্পর্কের সমাপ্তি। এক পৃথিবী মানুষের মাঝে বিভ্রান্ত অপা কোথায় যাবে কি করবে কিছুই ঠাউরে উঠতে পারেনা। ঠিক সেই সময় পথ-ভোলা অপার নরম হাতটা শক্ত করে ধরেছিল অঙ্কুশ।

"সেই তুমি ঘুমাওনি?" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাগত স্বরে বলে ওঠে অঙ্কুশ।
"ওমা! অপারানি এত রাতে কি লিখছ? বলেই কাগজটা টেনে নেয়। কিন্তু পড়েনা। প্রাণভরে গন্ধ নেয় অপার লেখার। বলে "অনেকদিন পর তোমার হাতে কলম। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। পাশে এসে বসে অঙ্কুশ। অপরাজিতার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে
"আজ নয়। কাল পড়ব।"

দূর্গা পূজা

সমরেন্দ্র কুমার দত্ত

শরতের আকাশেতে মেঘের খেলা,
শিউলির গন্ধে মনের দোলা,
দুব্বোর ওপরেতে শিশিরের জল,
মানুষের মন হয় বড় চঞ্চল।
দেবী আসে পৃথিবীতে শুধু চারদিন,
আনন্দে বাঙালি মাতে বিরাম বিহীন।
ঠাকুরকে কাছে পেয়ে মনের আশা
জানাতে ব্যগ্র হয়, পেতে ভরসা।
সারাদিন মণ্ডপে সময় কাটে,
পূজোর আঙ্গিকে ঢাক বেজে ওঠে।
পুরোহিত মন্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়ায়,
অঞ্জলি, প্রার্থনা মনকে ভরায়।

প্রণাম, কোলাকুলি সাঙ্গ হলে পরে,
সুমধুর পুজোর রেশ যায় দূরে সরে।
সন্ধ্যার পরে নামে মানুষের ঢল,
রাস্তায় হেঁটে চলে, করে কোলাহল।
ঠাকুর দেখতে হবে, যত পারা যায়,
অগোছালো ভাব থাকে তাদের চলায়।
এই ভাবে কেটে যায় পুজোর ক'দিন,
স্মৃতির পটেতে আঁকে স্বপ্ন রঙিন।
বিজয়া দশমীর দিন বিদায়ের সুর,
ঠাকুর যাবে যে চলে দূরে, বহু দূর।
বিসর্জনের পর গঙ্গার জলে,
শান্তির সুখটুকু পায় যে সকলে।
পুজো-পুজো ভাব শেষে , শেষ হয়ে যায়,
আনন্দে কাটানো দিনের ছাপ রেখে দেয়।

Suchetana chakraborty

Kid's Corner

aMAZEing Mystery!

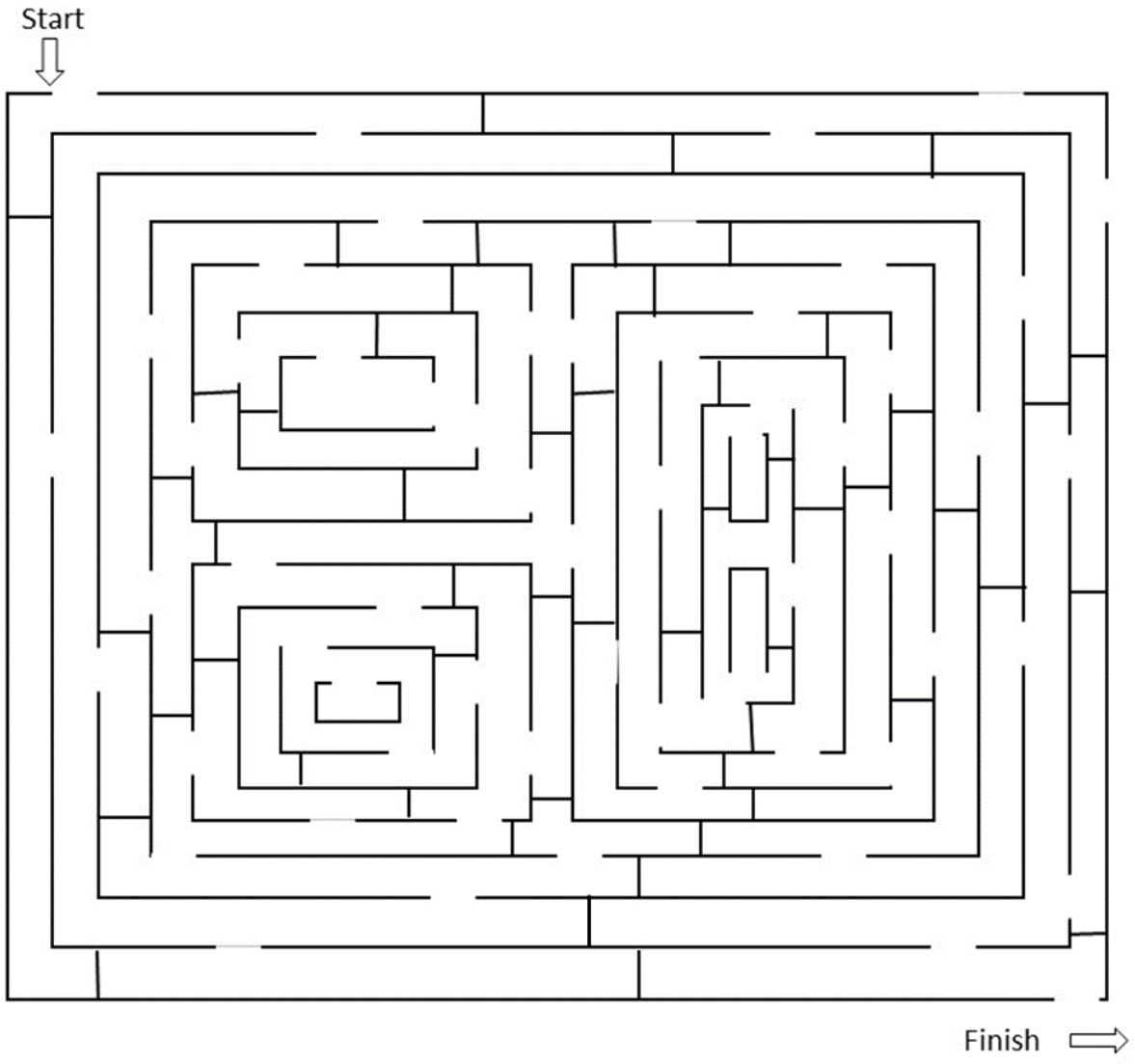

by Netra Mirajkar

Refer to the Solutions page – for answers

Durga Puja 2019

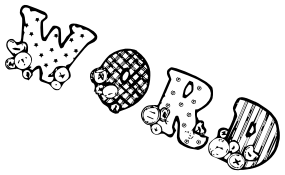

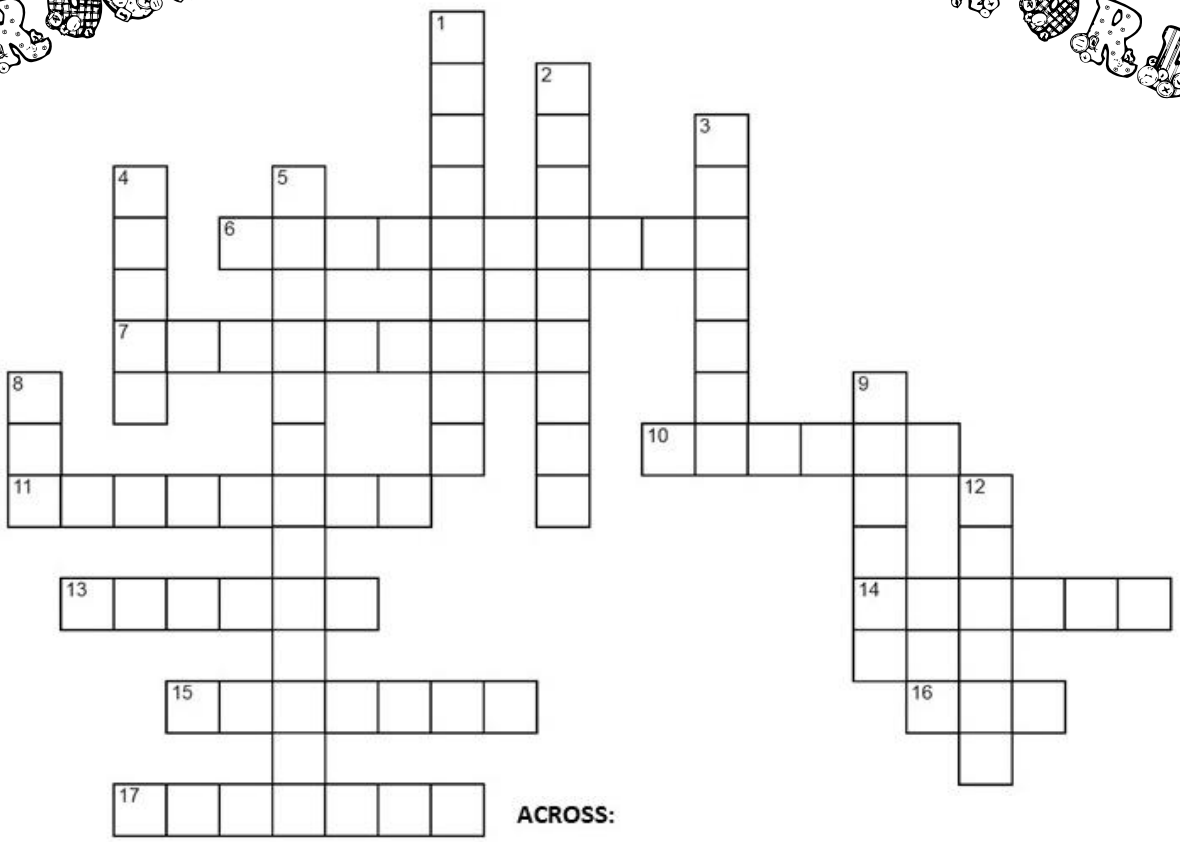

by Indranil Sinha

ACROSS:

6 What is the name of the asur whom Ma Durga defeated before Durga Puja?
7 Which festival is celebrated on the last day of Navaratri?
10 Home of Durga
11 When does Devipaksha begin?
13 Which Indian month durga puja celebrated?
14 Name of the special puja performed between 8th and 9th day of Durga Puja.
15 Kartikeya's vehicle
16 Ma Durga has how many hands?
17 When is the Bodhan performed?

DOWN:

1 Goddess of knowledge
2 What is another name for Durga Puja in other parts of India?
3 Name the deity from whom Mahishasur, the demon received the boon of immortality?
4 One of Shiv's General
5 Husband of Durga
8 Who started the practice of worshipping Goddess Durga in autumn, better known as 'AkalBodhon'?
9 Durga's son
12 On Shiv's head

Refer to the Solutions page – for answers

CODI'S CODING CORNER

Rohin Banerjee

Try figuring out this encrypted message –

What is: 4,21,18,7,1 16,21,10,1 9,19 7,18,5,1,20 27

The Clue for the message is:

A=1, b=2, c=3 ,d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9, j=10, k=11, l=12, m=13, n=14, o=15, p=16, q=17, r=18, s=19, t=20, u=21, v=22, w=23, x=24, y=25, z=26, !=27.

If you want an extra challenge try adding all the numbers in the encrypted message , dividing the number by 5 , multiplying it by 49 and adding ten. Then add it to the start of the sentence that was encoded.

If you do it correctly you´ll know what I mean.
Good luck!

Refer to the Solutions page – for answers

Kid's Corner - Solutions

aMAZEing Mystery

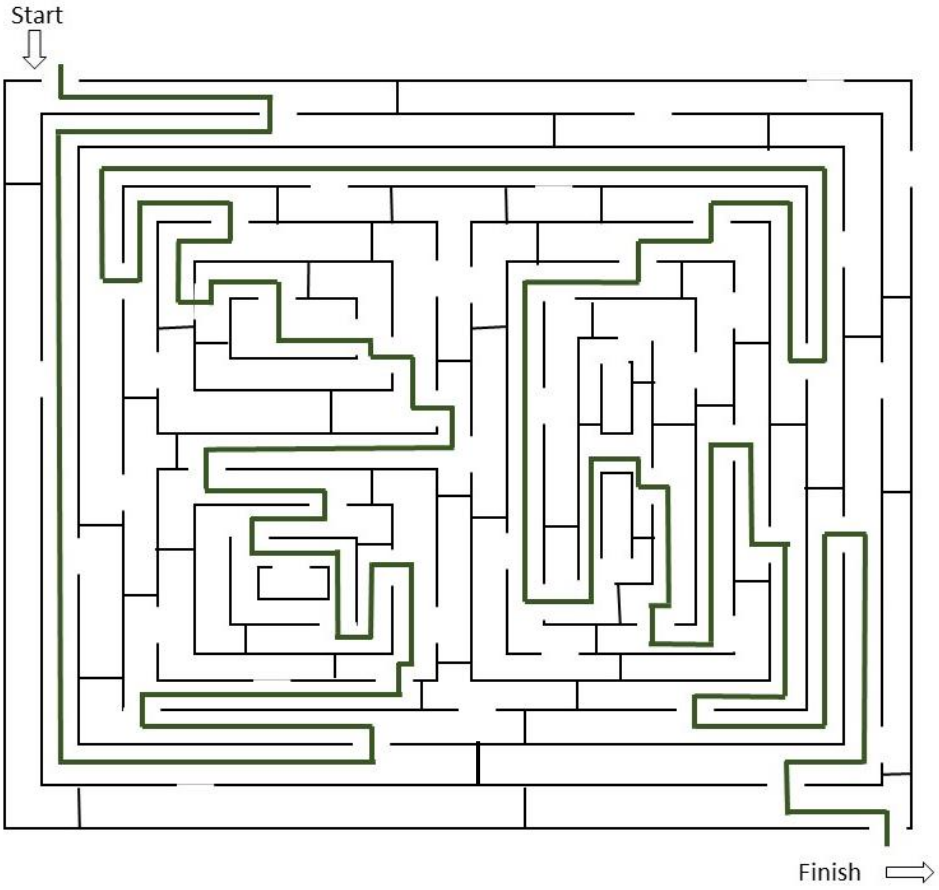

CrossWord

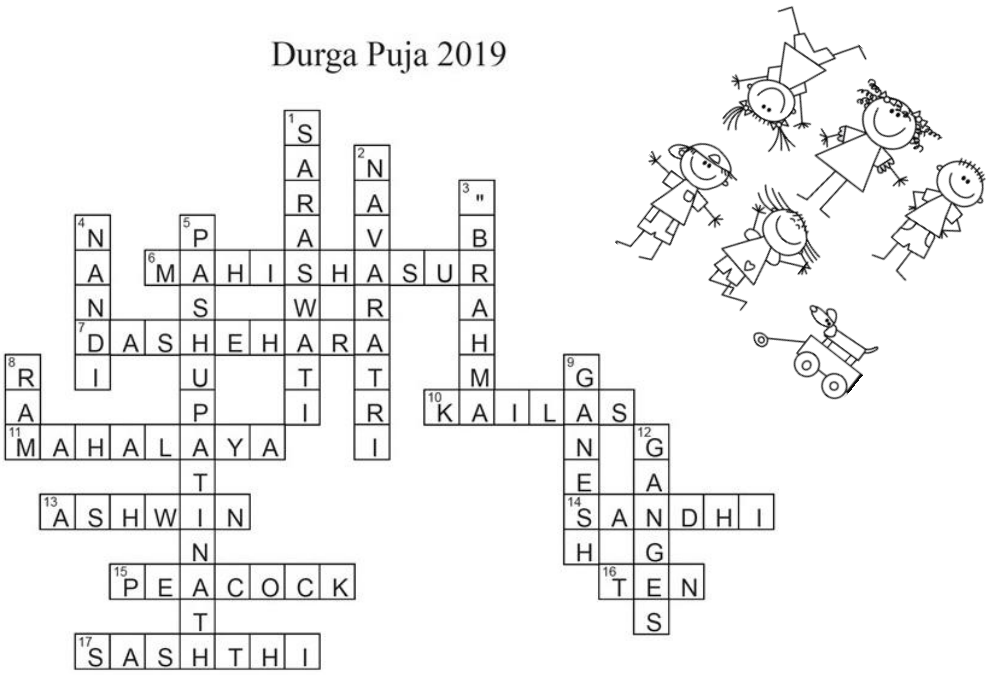

Codi's Coding Corner ⟶ ***2019 Durga Puja is Great !***

Min resa till Legoland

Sristi Chatterjee

Place: Kista, Stockholm
Date: 13th September, 2019

Jag ska skriva idag om hur min resa till Legoland var. Jag ska börja med hur jag kom dit. Den tid tågen kom var en "riktigt" bra tid eftersom tåget kom 23:30 och vi kom till plattformen kl 22:30. Så vi väntade vid stationen i 1 timme. När vi var där så orkade vi inte stå och alla bänkar på plattformen var fulla, så vi fick sitta på golvet. Jag ville inte sitta på golvet (såklart) fast jag orkade inte stå. Istället behövde jag sitta på en papper,på golvet. Diti och hennes familj kom efter 45 min alltså 23.15. Tåget kom 15 min tidigare än det skulle. Vi klev in i tåget. Det var första gången jag sov i en tåg. Min pappa och Diti´s pappa fick sova i en annan rum. Efter några (väldigt långa)timmar var vi framme. Fast först behövde vi checka in. Castle Hotel var super fin. Vi hade bokat för “The Wizard Room”. Efter det kunde vi verkligen gå in i Legoland. Vi hade bara en problem när vi skulle skanna biljetterna. Några funkade inte,så vi slösade 10(kanske mer eller mindre) min. Den första vi gjorde var att äta eftersom alla var hungriga. Det var en buffet. Sen såg vi Mini Land. Den var extremt fin. På varje grej där fanns det fakta om vad det var. T.ex. Det har var Øresund bron. Vi gick runt typ hela Mini Land. Tänk att allt var gjort av lego. Min syster åkte sen på en karusell , jag och Diti stod också på led fast vi för långt. Jag har aldrig hört för lång alltså seriöst. Efter det åkte ville jag och Diti få våran körkort. Diti´s pappa bokade en tid,vi fick välja vilken land och vilken språk(jag och Diti valde Sverige och svenska..Sen gick vi till Sea Life ,det var okej fast om du har varit i Stockholm Aquaria (ni måste åka dit nån gång) då var det inget. Vi tog väldigt många bilder och vi var i Legoredo Land . Där gick vi bara runt och våran tid för körlektion kom. Jag och Diti var klar med våran lektion(jag spolade 30 min framåt). Sen var vi i Duplo Land. Allt där var väldigt stort fast det fanns knappt något intressant(tyckte jag). Vi åt väldigt mycket. Efter det sov vi i hotellet. Dagen efter gick vi runt och tog många bilder. På slutet gick vi till Legobutiken. Diti köpte en Harry Potter lego. Min syster köpte en Lego Friends och jag köpte en Lego BB-8. Tillsist åkte alla av oss hem. Jag vilde bara säga att alla byggde klart på dagen vi kom in i huset byggde alla klart sina Lego.
Det var en väldigt underbart resa.

Apollo II

Rohin_Banerjee

The eagle has landed.

-Neil Armstrong

Those words were just words just like when one says good morning to a friend or when one gives a presentation in front of a class, but those words were historic, those words meant the United States of America had succeeded to land a man on the moon. This was thought impossible only a hundred years before Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed there.

Okay now you are probably wondering why would America suddenly want to land on the moon. Well it wasn´t exactly suddenly because at the time America was involved in the space race with USSR (also known as the Soviet Union) during the cold war. USSR had already had some major wins in the space race such as, (but not limited to) the first satellite in space, first man in space and the first woman in space. America was losing everything in the space race and they knew it. America had to win some thing so America shot for the stars and reached the moon. America founded the Apollo program (Apollo being the Greek god of the sun and poetry) to send a man to the moon.

The rocket that would carry the people to the moon couldn´t be just some ordinary rocket like the ones that took Yuri Gagarin or Alan Shepard in to space. It would have to be more advanced, larger and it would need to have more space (for fuel) than any rocket ever built before. The rocket in charge of taking the people to the moon was called the Saturn V. This was the largest rocket ever built by humanity and to this day it holds the record for largest rocket ever built by humanity. The Saturn V was a triple staged rocket (meaning it consisted of three thrusters that fall off into space) and was over 300 feet tall.

Now these are the parts of the rocket top to bottom.

1. Emergency launch escape. This is the part of the rocket you see as the pointy thing on top and as its name states its purpose: for emergencies during launch.
2. Up here was the command module. The command module was the only part of the rocket that would return to earth. This is where the astronauts sat during lift off all the way to until they landed on the moon and after they came back from the moon they would sit there until the came back to earth. This was also the place where everything was controlled. Hence the name command module.
3. Below the command module was the service module which was basically like guide rocket for the command module to take it to the moon and back to earth.
4. Below that was the lunar module which was the part that landed on the moon. The lunar module was surrounded by a protective cone.

   Bellow even that was three main rocket boosters. The first stage rocket, the second stage rocket and the third stage rocket. The thrusters fell off one by one first stage rocket going first and third stage rocket falling off last. The first stage rocket was supposed to take the rocket out of the earth´s atmosphere. The second stage rocket pointed the rocket in the right direction and took it some way there to the moon and the third stage rocket took the rocket half way to the moon. The first stage rocket was the largest rocket and the third stage rocket was smallest rocket.

Now you are probably wondering how all those parts fit in to the mission to the moon. Well here is how the mission went.

Kennedy Space centre (1969)

The Saturn V stood on the launch pad ready to launch. The countdown had started and Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins were seated in the rocket. The countdown went on. 10….9….8….7….6….5….4….3….2….1…. Blast off! The rocket shot off into space thousands of Kms/Hour. A few minutes later the rocket brock free of the atmosphere and the first stage rocket fell off along with the emergency launch escape. After a while the rocket was pushed in the right way and propelled in the right way and the second stage rocket fell off. When the rocket was almost to the moon the third stage rocket fell off. The cone the lunar module was in detached from the rocket and it fell off. The lunar module latches on to the command module and service module. The rocket takes an orbit around the moon making the ones in the rocket the first ones to see the back side of the moon. Armstrong and Aldrin climb into the lunar module and go to the moon with it. After they landed on the moon Armstrong and Aldrin take a moon walk in which Armstrong delivers the famous words “this is a small step for man but a giant leap for mankind”.
After the moon walk the astronauts went back to the command/service module after which the lunar module fell off after transferring specimens to the command module. After that the service module takes the command module back to earth and the service module falls off. The command module starts to burn up in the atmosphere and lands in the ocean. The astronauts are safe and the command module is picked up by a ship.

Hope fully now you got why everything was there. If your still wondering why there was the emergency launch escape the answer is simple: to decrease the chance of death. Also when I say “fell off” I mean fall and drift off into space as junk.

Saturn V rocket above

Let’s Look into some More facts on Apollo 11/ program

- The original crew for Apollo 11 were actually not Neil Armstrong , Buzz Aldrin and Michael Collins but sadly the original crew died.
- There were test Apollo programs too e.g. Apollo 6 before the Apollo 11
- Because when the lunar module would go from the lunar surface to the command module you need it to be as light as possible so the astronauts left stuff behind, including their excretion.
- Apollo 17 was the last Apollo mission. The missions stopped after that because the were getting way too expensive.

If you would like to research and know more go to NASA website for more info.
https://www.nasa.gov/feature/nasa-helps-bring-story-of-historic-moon-landing-neil-armstrong-to-younger-generations

Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins above

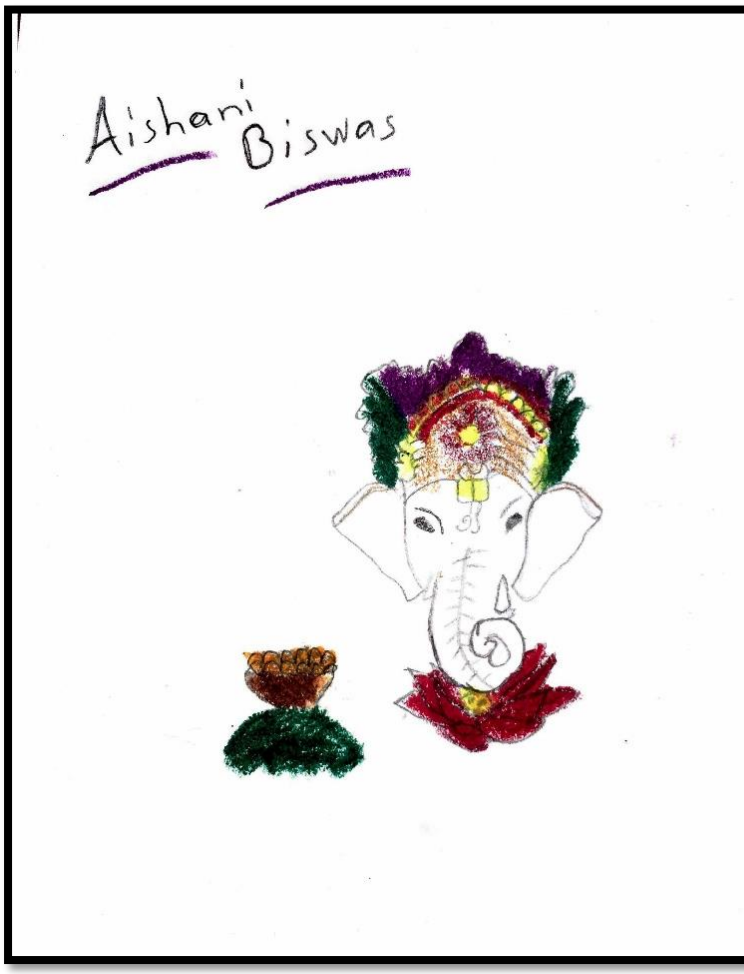

A bad dream

Achirshman Dev

AAAH! I screamed,
It was a terrible nightmare.
So what happened? I was dreaming that I went to an ice cream truck where I got a chocolate ice cream for free! I was so happy…Suddenly I got sucked in a black hole and couldn't get out.
In the black hole there was a lot of monsters, so I went to the other side of the black hole, but they followed me (which was creepy). So I tried to get out of the black hole, suddenly the black hole opened and I got out. But when I did get out the monsters followed me and was destroying everything around my city, Stockholm and me.
Soon the whole Stockholm was destroyed and I was the only survivor left. After some time the monsters were trying to eat me. So I ran, I ran so much that I almost reached to a different city in Sweden.
Suddenly one monster grabbed me and took me to an underground cave. The cave was huge, I was scared because the monster lit up a fire and I thought he was going to grill me. But I was wrong. This one was a friendly monster who was trying to help from the others.
Thank god, I survived this time.

Srinivasan Anand

Dancing forms and comical totems

Den avundsjuka Tjejen

Författare: Sukumar Ray
Översättning av: Ditipriya Mitra Ray

Det var en gång en dum tjej som var jätte avundsjuk och bråkig. Men jag kan inte säga hennes namn för om det finns en trevlig och lugn tjej med samma namn kommer hon att bli arga!

Den avundsjuka tjejens stora syster var väldigt lugn och snäll och duktigt på allt. Den avundsjuka tjejen är sju år och är inte ens klar med första läroboken. Men hennes stora syster som bara är ett år äldre har redan läst ut andra läroboken och Ramayana för barn. Hon blev klar med Engelsks första lärobok för länge sen. Stora syster går till skolan och får en massa priser men den avundsjuka tjejen får straff och skäll.

När storasyster fick en bilderbok om pris och den avundsjuka tjejen inte fick något skulle du ha sett henne! Hela dagen satt hon och snyftade och surade. Hon pratade inte med någon.

Och sen på natten tog hon hennes stora systers fina bok och hällde färg på den och sönder den och hällde lera på den. Så elak och avundsjuk var hon.

Deras morbror kom och hade med sig tårta till båda två. Den avundsjuka tjejen kollade på sin systers talrik en liten stund och brast sedan i gråt. Morbror kollade beströtт på henne och frågade ”vad hände betade du dig i tungan?”
Hon sa ingenting och fortsatte bara att gråta. Då sade hennes mamma ilsket: "Vad hände, säg då!" Då grät hon, "systerstycket är större än mitt."
När hon hörde det ger systern snabbt sin egen tårta. Men den avundsjuka flickan kunde inte ens äta hälften av vad hon hade fått, så hon kastade resten.
När systern får nya kläder på sin födelsedag, så skriker den avundsjuka tjejen så mycket att taken liftar!

En dag när hon kollade sin mammas gardrobe såg hon en jätte fin docka med en röd klänning och röda skor. ”Ser man på! Systern måste ha bett morbror om att få den och sen bett mamma att gömma den från mig”. Sa hon för sig själv. Hon blev jätte arg. Och tänkte, ”jag är lilla systern, jag borde få dockan. Varför ska min stora syster få den!” Sen tog hon upp dockan och höll den liten stund.

Vilken fin docka! Vilka verkliga ögon, vilken söt mun, vad små händer och vad fina kläder! Ska systern få allting som är fint? Hon började nästan gråta. Hon blev så arg att hon slängde dockan på golvet. Men hon var fortfarande arg. Hon hämtade en stor och tjock pinne och började att slå dockan jätte hårt. Efter att ha tagit sönder dockan ack rivit sönder hennes kläder, slängde hon tillbaka den i lådan. Sen stampade bort medans hon mumlade argt.

På kvällen ropade morbror på henne, ”har du inte sett vad jag har köpt till dig?” Hon kom springande och sa, ”vad morbror, vad….ge det till mig, ge det till mig..!”

Morbror sa, ”Gå till din mamma och fråga. Jag har en så fin docka till dig”. Hon blev så glad att hon började dansa och sa, ”vart har du lagt det mamma?”. Mamma sa, ”Den är i min gardrobe”
När han hörde det började den avundsjuka tjejen hjärta slå snabbare. ”Hade den röd klänning, röda skor ock lockigt svart hår?” Mamma sa, ”Ja, har du sett den eller?”

Den avundsjuka flickan kunde inte säga något. Hon stod där et liten stund helt tyst……och så helt plötsligt började hon gråta och sprang därifrån.

Om hon inte kan sluta vara avundsjuk på allt nu, så vet jag inte hur hon kommer att sluta !!!

(এই লেখাটি শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায়ের হিংসুটি গল্পের Swedish অনুবাদ)

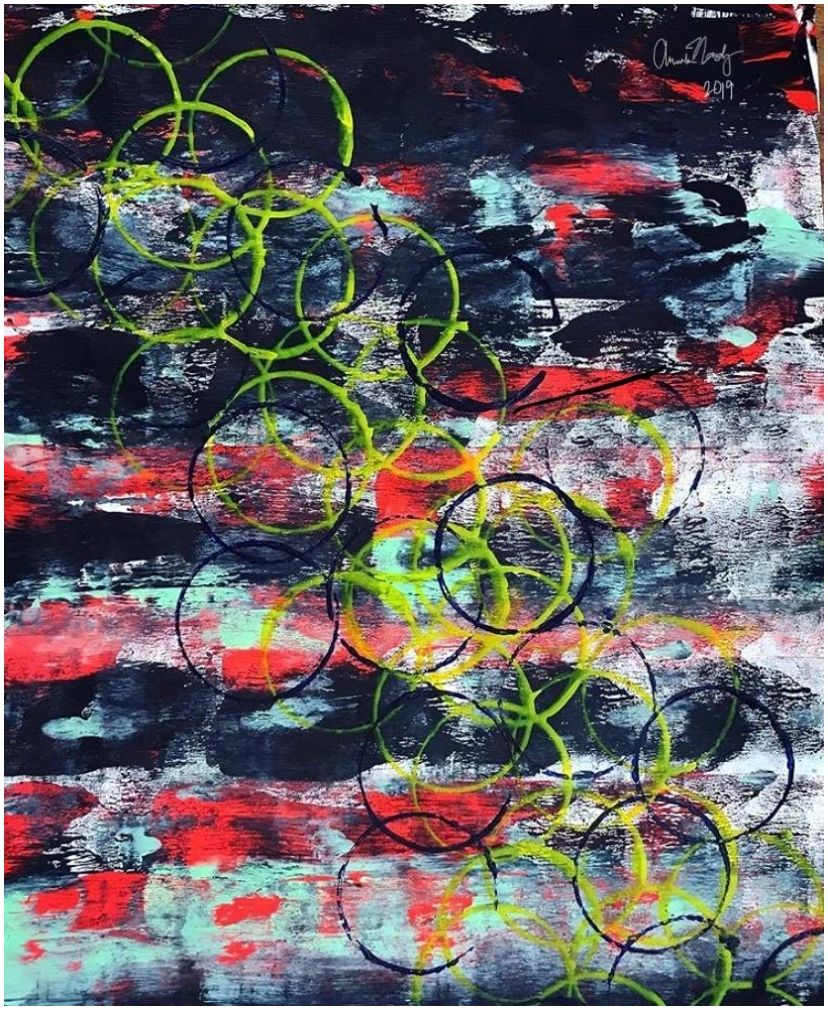

Mehal

সত্যি ডাকাতের গল্প

ইন্দ্রনীল সিংহ

অনেক দিনের কথা। ইংরেজদের শাসন কাল। বাংলার এক অঞ্চলে এক স্বনামধন্য জমিদার বাস করতেন। জমিদারবাবু নিজের প্রজাদের কাছে খুবই প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী।
জমিদারবাবু একদিন বিকেল বেলায় নিজের বাড়িতে বসে প্রজাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন, এমন সময় দুজন পেয়াদা একটি লোককে নিয়ে উপস্থিত। লোকটি যেমন লম্বা তেমনি তার স্বাস্থ্য। লোকটি জমিদারবাবুকে প্রণাম করে একপাশে সরে দাঁড়ালো। পেয়াদারা যা বললো তার সারমর্ম এই যে লোকটি একটি ডাকাত দলে কাজ করে, এবং বহু ডাকাতি করেছে। জমিদার বাবুর অঞ্চলেই তার বাড়ি। সে বাড়ি এসেছে শুনে পেয়াদারা গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসেছে। জমিদারবাবু সবাইকে ওখান থেকে চলে যেতে বলেন। সবাই চলে গেলে তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন "কি নাম তোর"? লোকটি বলে "শিবু"। বাবু জিজ্ঞাসা করেন "সত্যি কি তুই ডাকাতি করিস"? শিবু বলল "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু"। বাবু বললেন "তোর বাড়িতে কে কে আছে" ? "আজ্ঞে আমার বাবা-মা বউ ছেলে-মেয়ে সবাই আছে", লোকটি বলল। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন "তুই ডাকাতি করিস কেন? অন্য কোন কাজ করতে পারিস না"? "সবাই আমাকে দেখলেই দূরে পালায় ,কে আমায় কাজ দেবে আর বিশ্বাসই বা করবে কি করে"? "আমি যদি তোকে কোন কাজ দিই"? বাবুর কথা শুনে শিবু ডাকাত একেবারে চমকে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে সে অবিশ্বাস্যভাবে জিজ্ঞাসা করল "আমি একটা ডাকাত জেনেও আপনি আমায় কাজ দেবেন"? "তুই যদি আমায় কথা দিস যে তুই আর কোনদিন ডাকাতি করবি না তবে আমি তোকে আমার পেয়াদার দলে নিযুক্ত করে দেব"। বাবুর কথা শুনে শিবু জমিদার বাবুর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল "আমি আপনার পা ছুয়ে বলছি বাবু আমি আর কোনদিন ডাকাতি করব না"। "তবে যা কাল থেকে তুই তোর কাজ বুঝে নিবি"। শিবু আর একবার বাবুকে প্রণাম করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

পরেরদিন লোকে এই ঘটনা শুনে ভাবলো জমিদারবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নইলে কি কেউ একটা ডাকাতকে নিজের পেয়াদা নিযুক্ত করে। কেউ কেউ আবার জমিদারবাবুকে এসে বলে গেল বাবু যেন লোকটিকে বিশ্বাস না করেন, লোকটা সত্যি সত্যি একটা বড় ডাকাত দলের সর্দার। কিন্তু জমিদারবাবু কোন কথাই শুনলেন না -সেইদিন থেকে শিবু পেয়াদা কাজে বহাল হল।
দেখতে দেখতে বেশ কয়েকমাস সময় কেটে গেল। শিবু কেবল জমিদার বাড়ির নয়, অন্যান্য বহু লোকের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। এমনকি যারা প্রথম প্রথম তার অবগুণ গেয়েছিল তাদের ও এখন শিবুর সঙ্গে দোস্তি।
একদিন বিকাল বেলায় ম্যানেজার বাবু জমিদার বাবুর কাছে এসে বললেন -"উপর থেকে খাজনা জমা দেওয়ার আদেশ এসেছে"। "খাজনা কি আদায় হয়েছে ?" জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। ম্যানেজার বাবু বললেন "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর"। জমিদার বাবু বললেন "তবে কালই রওনা হয়ে পরো "। ম্যানেজার বাবু একটু কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন তাই দেখে জমিদারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন- "কিছু বলবে "? ম্যানেজার বাবু বললেন, "দুজন পেয়াদা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে আর একজনের শরীর খারাপ তাই আর যারা রয়েছে তাদের মধ্যে কাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় বুঝতে পারছি না "। "কেন শিবুর কি হল "? ম্যানেজার বাবু ইতস্তত হয়ে বললেন, " কিন্তু সে যে এক কালে একটা ডাকাত ছিল আর রাস্তাতেও ডাকাতের ভয়, এতগুলো টাকা নিয়ে কি ওর সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে "? জমিদার বাবু বললেন, "তুমি শিবুকে বিশ্বাস করতে পারো "। ম্যানেজার বাবু ইতস্তত ও সামান্য ভীত হয়ে বিদায় নিলেন।

পরদিন কাকভোরে ম্যানেজার বাবু খাজনা নিয়ে শিবু পেয়াদার সঙ্গে গরুর গাড়িতে রওনা হলেন। পথ সামান্য নয় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে তাই সঙ্গে খাবারের ঝোলাও নিতে হলো।দেখতে দেখতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গরুর গাড়ি লোকালয় ছেড়ে কালাহারি মাঠে এসে পড়ল। এই সেই মাঠ যে মাঠের নাম করে মায়েরা দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়ায়। যে মাঠে রাত্রে কেউ একবার ঢুকলে সে আর ফিরে আসে না, ফিরে আসে তার লাশ নদীর জলে ভেসে যে নদী এই মাঠের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। এই মাঠ পার হতে যেকোনো গরুর গাড়ির আট থেকে নয় ঘন্টা লাগে। এই মাঠেই থাকে একাধিক ডাকাতের দল যারা মাঝে মাঝে লোকালয়ে হানা দেয় ডাকাতি করতে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। মাঝে একবার খাবার খাওয়ার জন্য গরুর গাড়ি থেমেছিল। খাওয়াদাওয়ার পর আবার চলা শুরু হয়েছে। এখনো পথ যে কতটা বাকি তা কেজানে। ম্যানেজার বাবু ভাবছিলেন কখন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে তারপরে কি কি করতে হবে ইত্যাদি। শিবু অতীতের কথা চিন্তা করে চলেছে। একদিন সে ছিল এক ডাকাত দলের সর্দার। জমিদারবাবুর দয়াতে পেয়েছে বাড়ি, একটা মাইনের চাকরি। তার থেকেও বড় আশেপাশের লোকদের ভালোবাসা। আজ তার ছেলে মেয়ের সঙ্গে অপরের ছেলেমেয়েরা খেলা করে যা কয়েক মাস আগে ছিল এক স্বপ্ন।হঠাৎ গরুর গাড়ি থামার ফলে তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। গরু দুটো এতটা পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চালকের শত চেষ্টাতেও গাড়ি আর নড়ে না। এদিকে মাঠ পার হতে এখনো অনেক বাকি। ম্যানেজার বাবু রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু নিরুপায়। প্রায় একঘন্টা পরে গরু দুটো আবার চলতে শুরু করল কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যে হবো হবো। ধীরে ধীরে অন্ধকার সমস্ত মাঠটাকে গ্রাস করে নিল। চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়না। আকাশে চাঁদ নেই যে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। এইভাবে গাড়ি কতক্ষণ চললো কে জানে। হঠাৎ বহুদূরে ছোট্ট একটা আলো দেখা গেল।গাড়িতে এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিল না। এই আলো দেখে ম্যানেজার বাবু আনন্দিত হয়ে বললেন, "দেখো শিবু আমরা মনে হয় এসে পড়েছি "। শিবুর মুখে কোন কথা নেই। নিজের তেল চকচকে ডাকাতে লাঠিটা সে আরও শক্ত করে ধরল, তার মনে আশঙ্কা.....

আলোটা গরুর গাড়ির গতির চেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। নিমেষের মধ্যে সেই আলো একাধিক আলোয় পরিণত হল। দেখতে দেখতে বোঝা গেল গোটা বিশেক ডাকাত মশাল হাতে গরুর গাড়ি টাকে ঘিরে ধরেছে। এই দেখে গাড়ির চালক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির নিচে আশ্রয় নিল। ম্যানেজার বাবু ভয়ে শিবুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শিবু যত বলে "আমাকে ছাড়ুন , দেখি কি করা যায়" ম্যানেজারবাবু তত শিবুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অবশেষে অনেক কষ্টে শিবু যখন নিজেকে ছাড়িয়ে গাড়ির উপরে উঠে দাড়ালো তখন ডাকাতের দল সমস্ত গরুর গাড়ি টাকে ঘিরে ফেলেছে। চারিদিকে জনাবিশেক ডাকাত, গায়ের রং কুচ কুচে কালো, চোখ তাদের রক্ত জবার মত লাল। কোমরে দেখা যায় তরোয়ালের বাট। এক হাতে মশাল আর এক হাতে তেল চকচকে লাঠি।ম্যানেজার বাবু এইসব দেখে আধমরা হয়ে বসেছিলেন হঠাৎ তিনি চোখ মেলে দেখলেন শিবু আর গাড়িতে নেই সে তার লাঠির ভরে যেন উড়ে উড়ে একবার গাড়ির সামনে যাচ্ছে আবার পরমুহূর্তে পেছনে চলে যাচ্ছে একবার যাচ্ছে ডাইনে আবার আর একবার যাচ্ছে বামে। তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে দ্রুতলয়ের এক ডাকাতে বুলি যা ম্যানেজারের বোধগম্য নয়। কিন্তু এই বুলি আর লাঠির নাচ দেখে ডাকাতের দল এমনি অবাক যে তারা তাদের লাঠি তুলতে ভুলে গেল। এমন বুলির সঙ্গে এমন নাচ একজন লোকই করতে পারে যে কয়েক বছর আগে ছিল তাদের দলের সর্দার তবে কি এ সেই.....

হঠাৎ নাচ গেল থেমে। শিবু আবার এসে দাঁড়াল গাড়ির উপর। তার সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। চোখ দুটো লাল টকটকে। গুরুগম্ভীর স্বরে সে বলে উঠলো "জয় মা কালী"। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ডাকাতরা বলে উঠল "জয় মা কালী"। তাদের চিনতে আর বাকি থাকলো না। তারা বুঝে গেল এই তাদের শিবু সরদার যার সঙ্গে তারা বহুকাল ডাকাতি করেছে, শিখেছে লাঠির আশ্চর্য মারপ্যাঁচ। ডাকাত দলের সর্দার আর থাকতে পারল না। সে তার লাঠিখানা ফেলে ছুটে এসে শিবুর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল। সে বলল "সরদার আমাদের ক্ষমা করো। আমরা বুঝতে পারিনি তুমি এই গাড়িতে যাচ্ছো। নইলে তোমার গাড়িতে ডাকাতি করার স্পর্ধা রাখি !"
শিবু ডাকাত সর্দারকে হাতে করে তুলে নিজের গলার সঙ্গে লাগিয়ে নিল। ডাকাত সর্দার যখন শুনলো শিবু জমিদারের খাস পেয়াদা আর সে এখন জমিদারের খাজনা জমা দিতে চলেছে তখন সে বলল আমরা কথা দিলাম আজ থেকে এই জমিদারের কোন ক্ষতি আমরা করবো না।

দুদিন পরের কথা। জমিদার বাবুর বাড়িতে একটা সভা হলো। সেই সভায় জমিদারবাবু সকলকে শোনালেন শিবু পেয়াদার কথা আর শিবু পেয়াদার হাতে তুলে দিলেন একশত স্বর্ণমুদ্রা আর কয়েক বিঘা জমি।

ঠাকুরমারা আজও নাতি-নাতনিদের শিবু পেয়াদার গল্প শোনান।

** গল্পটি একটি সত্য ঘটনার অবলম্বনে লেখা*

IVL Swedish Environmental Research Institute success story in India

Rupali Deshmukh

IVL Swedish Environmental Research Institute has a broad environmental profile. Unlike many other players, we combine applied research and development with close collaboration between industry and the public sphere. IVL Swedish Environmental Research Institute is based in Sweden but our clients and customers are found all over the world. We undertake research projects and contract assignments in the entire environmental field. At IVL environmental experts, engineers, social scientists, economists, and behavioral scientists work together. This enables us to work holistically and tailor each assignment to the customer's needs. The goal is to help clients develop resource- and cost-effective solutions that contribute towards a sustainable society. The broad scope of IVL's activities, combined with its multidisciplinary approach, enables IVL to offer its customers holistic solutions, as well as answers to highly specific problems. IVL is advisor the Swedish ministry of environment Swedish EPA (environmental protections agency) & Swedish confederation of Industries and National coordinator for smart city Sweden. The increased importance of regional and global environment issues has led to close international co-operation. IVL has gained a leading position within the international scientific community through coordinating, participating in and organizing projects and conferences e.g. within EU's research programmes.

IVL's first project in India was in the mid of 1970s, IVL carried out studies on effects of oil spill on coastal areas. Since then, IVL has been active in India in several projects and areas such as monitoring of air quality, establishment of environmental laboratories and capacity building on cleaner production
Form last 15 years IVL is working as advisor for the Swedish industry in Bangalore and Hyderabad in India. IVL has also been involved in research and training programs in India from few decades. Our activities in India have primarily targeted the introduction of more ecofriendly production processes and ramping up cooperation between India and Europe in the fields of environmental technology, energy, waste, transportation and biotechnology. IVL has experience working with Indian partners on several projects such as TERI, CII, Shriram Institute etc.

In 2010, IVL was partner with Scania on Nagpur WWTP and biogas project. IVL has strong expertise in Biogas. IVL is one of the partners in Swedish Biogas Consortium. IVL is also partner in EBTC's Waste to Energy Mission, India: A Resource Efficiency Approach to Waste Management. The objective of this Clean Tech Mission is to explore the opportunities of waste-to-energy in the state of Punjab and Himachal Pradesh, and from that also draw wider conclusions about the applicability of waste-to-energy by incineration. Sweden has total 42 incineration plant and our expert has deep knowledge in this area. Our experience from working in India and other Asian countries was a success criterion when IVL in 2009 was selected as a partner in an environment cluster for co-operation between the EU (Euro chambers) and India with focus on climate change and environmental technologies.
In 2014, IVL was appointed environmental advisor to the Indian Ministry of the Environment. IVL's role is to develop cooperation between the EU and India in environmental technology and to introduce smart, resource-efficient solutions that can help India reduce its emissions and manage limited resources. The focus is primarily on waste and water management issues. The idea is to exploit both

local know-how and EU expertise to promote the utilization of eco-friendly energy sources, energy efficiency and clean technologies.

Early last year IVL tested water conservation technology in Siliguri, India. This project "Sponge: sustainable potato farming in the eastern Himalaya Range" was funded by USAID, through SWFF.
Pune waste to energy project: Adar Poonawalla founded the Clean city initiative in January 2015 with the sole purpose of improving the environment and waste management in the city of Pune his home base Therefore, Serum Institute of India, the mother company of APCC, has consulted IVL Swedish Environmental Institute to conduct a pre- feasibility study for waste-to-energy plant in Pune. IVL's team visited Pune for a week in September 2018 to carry out an analysis of waste composition. The results indicated that the calorific value of mixed municipal solid waste in Pune is in good range. The waste incineration plant is planned at the Urali Devachi landfill site with grid connection point located about 1.3 km from the site. The next step is to carry out detail feasibility Study which will include detailed assessment of a 400 ton/day waste-to-energy (WtE) plant including recommendations on design, technology, finance, operation and maintenance.
Mumbai waste water treatment project: Last year in June IVL participated and prepared bids for general consultancy work for 7 waste water treatment facilities for City Mumbai and out of those won two. These are 6 years project

In April 2017, Together with Teknikföretagen and SIBC, IVL has built the platform "Smart city Sweden – India"

(*The overall objective of the project "Smart City Sweden-in India Cluster" was to develop a plan for the creation of a cluster of Swedish companies for international cooperation with the aim to accelerate the implementation of solutions related to the smart city concept. Another objective was to increase the opportunities for Swedish companies to be part of the Indian Industry.*
In 2015, Prime Minister Narendra Modi's vision "Digital India," has set an ambitious plan to build 100 smart cities across the country. Smart City Mission has lead India's urbanism to global platform and the World is looking forward towards India as global market opportunity. The Indian government has appointed the Confederation of Indian Industries (CII) as a coordinator and a facilitator of the till smart city program. The CII did open up for cooperation with six countries; USA, Spain, Japan, Germany, France and Sweden. A letter of interest was signed in late 2016 between Teknikföretagen and Confederation of Indian Industries which gives the opportunity and access for Swedish companies to be part of procurements and projects connected to the Smart City Mission program.
To meet the demand from the Indian cities to achieve their city mission and to increase the innovation and business relations between Sweden and India in the Smart City area Teknikföretagen launched the Smart City Sweden-in India platform in end of 2016. The platform is a partnership between Teknikföretagen, IVL Swedish Environmental Research Institute and SIBC. This platform visited several Cities in India in last 2years and trying to develop project for Swedish Industry.)

Smart City Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute is responsible for Smart City Sweden. Smart City Sweden is the national export and investment platform for smart and sustainable city solutions.

The Smart City Sweden Showroom is located in Hammarby Sjöstad. In our showroom, you will be able to explore smart and sustainable city solutions from all over the Sweden. The Smart City Sweden initiative is funded partly by the Swedish Government through the Ministry of Enterprise and Innovation and the Swedish Energy Agency, and partly by the industry and business promoting networks. It is managed by IVL Swedish Environmental Research Institute, in close collaboration with business promoting networks and organizations, as well as private companies.

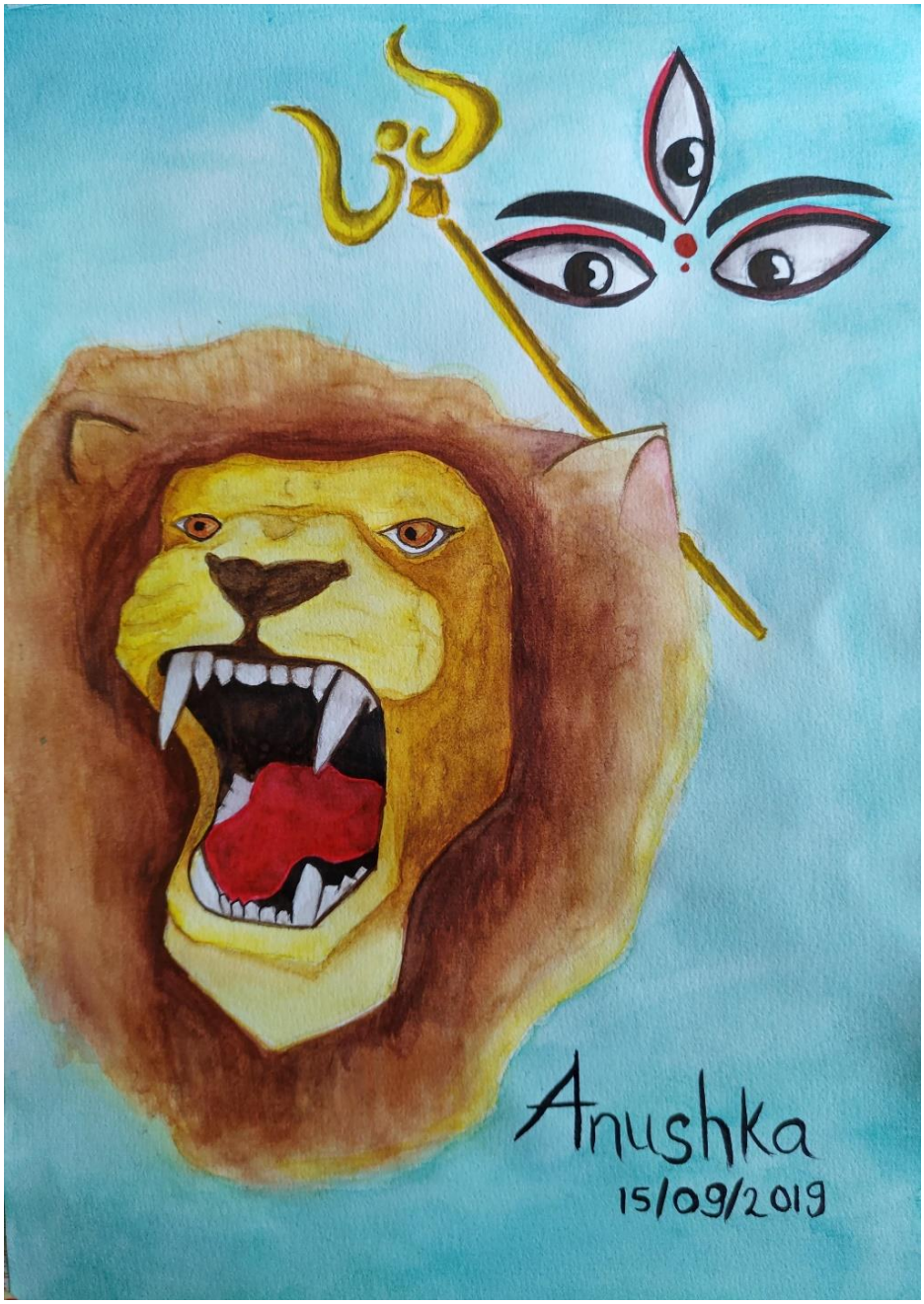

Anushka_Bhowmik

At a Memorial in Berlin

Amanita Sen

One of the charms of the city of Berlin, where I visited a year back, is in its concurrent presence of the old war-ravaged structures with the newly-built modern ones. In letting these bombed buildings, churches, stay in their unreformed look, Germany gives a glimpse of the tragic truth of war, to its newer generations. It is a lesson on war for all of us, for the tourists from other countries, who have not luckily faced yet, the calamity of a fallen bomb from the airspace. The sight of those once architectural beauties holding the tragic footprints of war is bound to encroach one's mental space, stir it in places that remained unperturbed so far. For me, however dramatic it might sound, it was revisiting the concepts of existentialism , nihilism, mortality, justice , God... I instantly knew, this visit to Berlin will not be easy for the mind.

The sun was almost on our head that August morning when we entered the Memorial to the Murdered Jews of Europe. Walking inside the maze of box-like structures resembling coffins, my friends and I were playing a game, the experience of which I have shared in a poem, at the end of this write-up.

With almost no sunlight making its way there,
the idea of the maze is to give the person visiting the place, a glimpse of the minds of the people inside the concentration camps. How while walking in the darkness we felt claustrophobic and direly in need for air, freedom!

We went to see the exhibition of the photographs of those years of Nazi rule. Right at the gate, we saw a quote emboldened which said that if this has happened in history, there is chance that it will happen again. Written by Primo Levi, one of the few holocaust survivors, this rudely brought for us the fear of another brutal war.

The photographs, as expected, were a close and personal view of the cruelty led by the SS group on the Jews. In one particular photo, a Rabbi was forcefully tonsured by the military who are seen laughing at him. The indignation in the eyes of the Jew at the torture, is hard to ignore.

There are excerpts of letters from the people in the camps, written to their families. Most of the letters speak of hope of being united with their loved ones again. Some simply speak of their wishes like having fresh bread and milk.
After a while I sought for some fresh air outside. The eyes went blurry making it difficult for me to read. Found that my friend was in a similar state. Some overwhelming experiences are benumbing and for

quite some time words failed us. It was a grim dusk greeting us outside the hall, when we set back for the hotel.

Man's search for meaning

Walking inside the maze
of the coffin-like structures
at The Memorial to Murdered
Jews of Europe, we played
a game of blurting out,
in a word, what came to our minds.
Sam said, "Hope",
Nilu said, "Anarchy",
I -"Death ".
And we came up with
"Fear", "Rage", "Fate",
"Desolation",
"Disillusionment"....
Just when the lights
broke upon us, it came
to my mind-
that word,
thwarting imminent deaths,
with its beauty, grace,
attributing purpose
to seeming-lives;
love!
Can't remember if I said that!

Memorial to the Murdered Jews of Europe

Just Like Me

Madhurya Dattagupta

Voices are trying to be free
but no one there to listen the spree
I can walk all day long
no one there to tag along.

If I climb a mountain high
will I find a friendly guy?
I don't care if he or she
tries to tap me, becomes free.

Few are there in this world
tries to help and prosper all
if I be one, help thy
that would be just like me.

Summer and Autumn

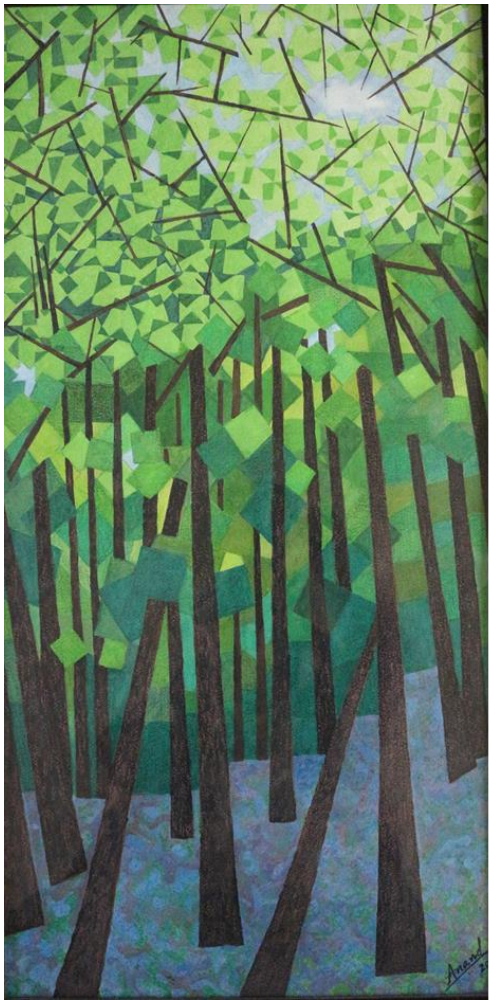

Srinivasan Anand

কাজ ভাঙা দিন

শর্মি চক্রবর্তী

একঘেয়েমি গন্ধমাখা কেজো সকালে হঠাৎ দেখা
কাজ ভাঙানো গল্পের সাথে।
দেখা মাত্রই হৈ হৈ করে উঠলে।
বললে, কালো,সাদা ছেয়ে রঙা পালক পালক মেঘের
নৌকো সাজিয়ে এনেছি, চল সাথে।
না সময় দিলে অবাক হতে, না সময় দিলে ভাবতে।
একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চললে,
হাল্কা মেঘের পাল্কিতে।
পায়ের পাতা ডোবা জমা জলে,
শুকনো পাতার নাও ভাসানোর খেলা চললো
অনেকক্ষণ।
বর্ষা ভেজা নরম রোদ্দুর।
একলা দুপুর।
তালাত মেহমুদের গানে,
বিরান ভূমির ভ্রমর কালো তিলের সন্ধানে,
রহস্যময়ী চিলেকোঠা তখন।
তারা জাগা রাতের শেষে,
চিরনিত্যের যাওয়া আসা।
তবু,
' হৃদয় আমার আজ বলে তাই,
চোখের দেখায় যদি নাই পাই,
বাঁশি শুনেছে যে মন মনসা,
পথ চলিতে যে পাই ভরসা,
এই রিমঝিমঝিম বরষা….'

দিগন্ত শেষে

মৌমিতা ঘোষ

চল্‌তে চল্‌তে হটাৎ থম্‌কে দেখি
হারিয়ে গেছ তুমি আমার থেকে,
আবার হবে কি দেখা দিগন্ত শেষে
সব ভুল ভেঙে গিয়ে মনের থেকে?

সেদিন কি চিনে নিতে পারবে আমায়
মনে কি থাকবে বল নাম টি আমার?
হটাৎ মিলি যদি অজানা পথে
বলবে কি কথা তুমি আমার সাথে?
পরবে কি বল মনে পুরানো স্মৃতি
ফেলে আসা দিনগুলো,অসমাপ্ত আবৃত্তি!

হটাৎ চোখে যদি চোখ পড়ে যায়
আবেগের আলিঙ্গন মন যদি চায়,
মন যদি কোন বাধা সেদিন না মানে
কি করে ফেরাবে বল কোন অভিমানে?

অশ্রু নদী যদি কিনারা হারায়
সব কূল ভেঙে যদি মোহনা কে চায়,
কোন বাঁধে বাঁধবে বল সেই স্রোত কে
পাহাড় আর ভূমি ভেঙে আসছে যে ধেয়ে?
সেদিনের সেই প্রলয় আষাঢ় শ্রাবণ
ধন্য হবে আবার মানব জীবন!!

Siddharth Aryan Dev

কাজ করে চলে

সঞ্জীব দাস

ঝরনার জীবনটা পাথরের উপর পড়ে
তার গতি বেড়ে চলে
সে ধায় আরো আগে
তাঁর সাহসের স্রোতে
ভাঙ্গে কত পাথর কত বাধা
তৈরি হয় জীবন পথ
ধ্বংস সৃষ্টির নির্জন প্রান্তরে
আনে আনন্দের কলরব

সৃষ্টির সূর্য ওই পাথরের বুক চিরে ওঠে
তার আলো তৈরি করে পথ
কতদূর হয় নিকট
সেই আলোর স্পর্শে
গড়ে ওঠে কত জীবন সেতু

পাহাড়ের প্রাচীন জীবনের উপর
ভেসে যাওয়া মেঘের হাত
তার স্নেহের ছায়া মেলে ধরে
কত সবুজ কত জীবন ওঠে বেড়ে
মাঝে মাঝে জীবন পথের ভার
মৃত্যুর পাথরের ধ্বস নামে
কিন্তু ঘন কালো মেঘ সরিয়ে
সেখানেও পৌঁছায় সূর্য।

দুর্যোগের নিষ্ঠুর হাসি
বেদনার বাঁধভাঙ্গা স্রোত
আনন্দের দু এক কনা হাসি
সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে
তিন কালের আসনে বসে
ওই পাথর প্রাণ আজও
কাজ করে চলেছে।

(Dedicated to my uncle Late Ranjeet K, who was a civil engineer in Arunachal Pradesh, worked for PWD and built many roads, bridges in remote area of Arunachal Pradesh)

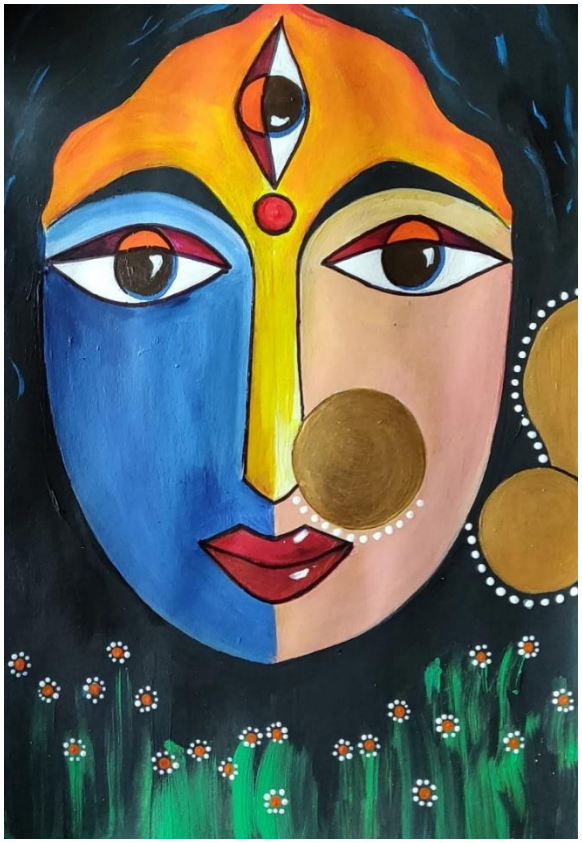

Manjoori Ganguly

হঠাৎ

উদ্দালক ভরদ্বাজ

সেবার গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে
কিরকম যেন বুড়িয়ে গেল সতীনাথ।

কিরকম যেন ম্যাজিকের মত-
মাথার পাশের চুলগুলো,
সকাল দুপুর, ক্লান্তির মেঘ গুলো,
স্বপ্নের ধরন গুলো-
পাল্টে গেল হঠাৎ।

অনেক ব্যায়াম, নিয়মের রান্না,
কসরত, সব মিছে হলো।
দেখতে দেখতে, বসার ঘরের
জানলার পাশের জীবন টুকুও।

সোনালী ম্যাগনোলিয়া গাছটার
নাগাল গেল অনেকটা উঁচুতে।
জানলা দিয়ে, আর ওর ফুল
দেখতে পেত না সতীনাথ;
শুধু একটা গম্ভীর খয়েরী কাঠ-
সাদা ফুলের বেড়াটাও, অযত্নে
অনেকটা লম্বা হয়ে, ঢেকে দিল
প্রায় সিকি ভাগ কাঁচ।

ব্যাক ইয়ার্ডে একটা নীল পাখি
আসতো, প্রত্যেক গ্রীষ্মে।
বসন্ত পার করলেই,
উত্সুক চোখে সতীনাথ যেত।
ওর মখমলের নীলে চোখ ভরে,
চোখ বুজে-
চেয়ে নিত অনেক স্বপ্ন.....

তিলতিল, মিতিল...
ছেলেবেলার অবাক গানের,
আধ-বোজা চোখ,
পাঁচিল পারের সাধ-
কোথায় যেন হারালো এখন,
সেই পাখি;

বা, সতীনাথ হারালো,
খয়েরি জীবনের বাঁকে,
তার চঞ্চলতা খোঁজার মন্ত্র।

Anusha

তখনই নেমে আসে সন্ধ্যা...

সুচরিতা

মহম্মদ রফি শুনলে আজও সুচিস্নেতার মনের ভিতরটা নড়েচড়ে ওঠে। সঙ্গে নচিকেতাও।

আগে যখন এই কম্বিনেশনের কথা ও বলত, বন্ধুরা তখন অনেকেই পিছনে লাগত। মাঝে মাঝে অবশ্য কখনও ঢুকে পড়তেন মান্না দে, তো কখনও এসপি বালসুব্রহ্মণ্যম। অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পছন্দ ছিল ওর। আজও তা বদলায়নি। এই পঁয়তাল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও একলা ঘর অন্ধকার করে আজও ভোররাত পর্যন্ত চলতে থাকে রফি, মান্না, নচি। তেতাল্লিশতম জন্মদিনে পাওয়া 'সারেগামা কারভাঁ'কে সঙ্গে করে নিয়েই ঘোরে ও। সে অফিশিয়াল ট্যুর হোক বা পার্সোনাল ঘোরাঘুরি— গানের ভাণ্ডার রাখতেই হবে সঙ্গে।

স্বর্ণাভকে কাজের জন্য বছরের প্রায় ছ'মাসই বাইরে থাকতে হয়। পছন্দের দিক থেকে ওদের এই মিলটা দারুণ। স্বর্ণাভও নচিকেতার ভক্ত। সুচিস্নেতার থেকে কিছুটা বেশিই। ও নচিকেতার নামে রীতিমতো পাগল হয়ে ওঠে। আর সেই সুযোগটাই এ বার বুদ্ধি করে কাজে লাগিয়েছে সুচি।

গত ছ'বছর ওরা দেশের বাইরে। আমেরিকায় দু'জনেই চাকরি নিয়ে চলে আসার পর ওদের জীবন থেকে চলে গিয়েছে নিয়ম করে নচির অনুষ্ঠান দেখা। খবরটা সুচির কাছে এসেছিল ম্যানহাটনের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির মাধ্যমে। অগ্নিশ্বরদা ফোন করে বলেছিলেন, ''২০ সেপ্টেম্বর নচিকেতা আসছে আমাদের এখানে অনুষ্ঠান করতে।'' সুচি তো শুনেই স্বর্ণাভকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল। স্বর্ণাভর কী রিঅ্যাকশন হবে, সেটা জানাই ছিল ওর। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বলেছিল, ''আমাদের জন্য দুটো টিকিট এখনই কেটে রাখ।'' ও এতটা উত্তেজিত ছিল যে, মনে হচ্ছিল পারলে তখনই কাজ ছেড়ে চলে আসবে!

বস্টনে রয়েছে স্বর্ণাভ। সেখান থেকে ওকে যেতে হবে লস এঞ্জেলেসে। তার পর ও ফিরবে ম্যানহাটনে। তবে সুচি জানে, ও যে ভাবেই হোক ২০ সেপ্টেম্বর রাতের আগে বাড়ি পৌঁছে যাবে। নচিকেতা বলে কথা! নচির সঙ্গে স্বর্ণাভর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এখনও যোগাযোগ রাখে নিয়মিত। সুচি না জানালে নচিকেতাই ওকে জানাত, আসছে। এখানে এলে এক দিন নচিকে বাড়িতে ডাকতে হবে লাঞ্চ বা ডিনারে, সেই প্ল্যানও তৈরি করে ফেলেছে স্বর্ণাভ ওইটুকু সময়ের মধ্যে।

ফোন ছেড়েই অফিসের জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছে সুচিস্নেতা। বাড়ি থেকে মেট্রোতে অফিস পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লেগে যায়। হাতে একটু সময় নিয়েই বেরোয় ও। মেট্রোর কথা কিছু বলা যায় না। এখানে সাবওয়ে ট্রেন বলে। ওর অফিস ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ ব্লকের ৯৯ তলায়।

সে দিনও সময় মতো পৌঁছে গিয়েছিল সুচি। হাতে এখনও অনেকগুলো দিন রয়েছে। স্বর্ণাভ যখন বলেছে, তখন ও চলে আসবেই যে ভাবে হোক। সেই কলেজ জীবনের পাগলামোটা আবার জেগে উঠেছে নচিকেতার নামে। সুচির মাথা থেকেও বেরোচ্ছেই না। নচিকেতার গানই গুনগুন করতে করতে অফিসে ঢোকে ও, ''আঁকবাঁকা সড়কটা...তখনই নেমে আসে সন্ধ্যা পৃথিবীতে আর বুকে...''।

একটি মাল্টিন্যাশনাল সংস্থায় সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের হেড সুচি। স্বর্ণাভর অফিসও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ওর অফিস সাউথ ব্লকে। স্বর্ণাভ থাকলে ওরা চেষ্টা করে একসঙ্গে বেরিয়ে লাঞ্চ করতে। না হলে এত বাইরে বাইরে থাকে, দেখাই হয় না। তবে প্রেমটা ওদের একই আছে, ক্রেজি। এই দূরত্বের কারণে ওরা সন্তানের কথাও ভেবে উঠতে পারেনি। বিদেশে একা একা সুচির পক্ষে সম্ভব নয়। চাকরি ছেড়ে দিলেও ও একা পারবে না। জানে দু'জনেই। সে কারণে ওরা সন্তান এখন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এক সঙ্গেই। যদিও মাঝে মাঝে যে সুচির সন্তানের শখ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না, তা নয়। তখন সব রাগ-ক্ষোভ চুপ করে শোনে স্বর্ণাভ। ও জানে, বোঝে, কী কষ্ট থেকে এই ব্যবহার করে সুচি! তার পর স্বর্ণাভর ভালবাসায় সেই রাগ চোখের জলে বয়ে যায়। ওরা আবার ভালবাসায় ডুবে যায়।

সব মিলিয়ে দু'জনে দারুণ আছে। সুযোগ পেলেই ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে দিকে দু'চোখ যায়। এটা সুচিস্নেতার প্যাশন। স্বর্ণাভ তাতে চোখ বুজে সমর্থন করে। ও জানে, সুচি ওকে খুব মিস করে। ও-ও। আর এই দৌড়ে বেড়ানো ভাল

লাগছে না। সুচিকে সেই কলেজের দিনের মতো মিস করে। চোখে হারায়। ‘‘এ বার অফিসে বলে ট্যুর কমাতে হবে। একটু টাকা কম আসবে, তবে আমাদের চলে যাবে,’’— মনে মনে ভাবে স্বর্ণাভ। এটা ভেবেই আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। সুচিকে এখনই বলবে না, ফাইনাল করে জানাবে। খুশিতে পাগল হয়ে যাবে। ও তো কত বার বলেছে, ‘‘টাকার দরকার নেই, তুই শুধু কাছে থাক আমার। দিনের শেষে যেন একসঙ্গে এক ছাদের তলায় ফিরতে পারি।’’

ইউটিউব খুঁজে ল্যাপটপে নচিকেতা চালায় স্বর্ণাভ। গান শুনতে শুনতেই অফিসের জন্য তৈরি হতে থাকে। মনটা ছটফট করছে ভীষণ। সুচিকেও হঠাৎ করে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। ফোন করে সুচিকে। কিন্তু ফোন ঢোকে না। স্বর্ণাভ ঘড়ি দেখে, বুঝতে পারে সুচি মেট্রোতে আছে। একটু পরে করবে আবার। খুব মিস করছে হঠাৎ করে। পুরনো সেই প্রেমের দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। কী ভাবে হাত খরচের টাকা জমিয়ে ওরা নচিকেতার অনুষ্ঠান দেখে বেড়াত। আর ঠিক খবর পেয়ে যেত কোথায়, কখন নচিকেতার অনুষ্ঠান। জয়কে মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে বস্টনের হোটেলের ঘরে বসেও মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে আজ জয়ের জন্য। কলকাতায় যত দিন ছিল ওরা, নচিকেতার পাশে জয়কে সব সময় মিস করেছে, যা এই প্রজন্ম বুঝবে না।

ঘরের ফোনটা বেজে ওঠে স্বর্ণাভর। উল্টো দিকে, রীতিমতো বিরক্ত সুচির গলা, ‘‘মোবাইলটা কোন চুলোয় রেখেছিস, বেজে যাচ্ছে ধরছিস না!’’ ল্যাপটপের ভলিউমটা বাড়িয়ে দেয় স্বর্ণাভ। ফোনের ওপারে চুপ করে যায় সুচি। কোন সুদূরে, বেজে চলে, ‘‘তুমি আসবে বলে আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি এখনও হয়নি...’’ সুচির ফেভারিট। গলা নামিয়ে সুচি বলে, ‘‘বুঝেছি, আবার নচিতে ডুবেছিস। তাই আমার ফোন শুনতেই পাচ্ছিস না।’’

নচি হোক বা যে কেউ, স্বর্ণাভর ইগনোরেন্স নিতে পারে না সুচি মোটেও। এই সব রকমের সুচিকে চেনে স্বর্ণাভ, তাই ওর অসুবিধে হয় না। সুচির ফোন ছেড়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে যায় স্বর্ণাভ। সুচির তত ক্ষণে দু’ঘণ্টা অফিস হয়ে গিয়েছে। সকাল আটটার মধ্যে ওকে অফিসে ঢুকতে হয়। সুচি হিসেব করে, দিন গোনে। আজ সবে পাঁচ তারিখ। আরও ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে স্বর্ণাভকে কাছে পেতে। ভাগ্যিস নচিকেতা আসছে। না হলে এই অপেক্ষা যে কত লম্বা হতো কে জানে। এটা ভেবেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

ডেস্কে মোবাইলটা বেজে ওঠে। স্বর্ণাভ— ‘‘শোন, বস্টন থেকে ন’তারিখ লস এঞ্জেলেস যাচ্ছি। টিকিট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিনই সকালে বাড়ি পৌঁছব। আগের দিন ম্যানেজ করতে পারলাম না রে।’’

সুচি একটু হতাশ হলেও কিছু বলল না।

‘‘আচ্ছা,’’— বলে চুপ করে থাকল।

স্বর্ণাভ বুঝতে পেরেছে। সুচিকে ভোলাতে বলল, ‘‘শোন, একটা দিন তো একটু ম্যানেজ কর। রাগ করিস না। এসে আরও একটা গুড নিউজ দেব। তোর সব রাগ উবে যাবে। শুনেই তুই আমাকে খুব আদর করবি দেখিস।’’

একরাশ অভিমান নিয়ে সুচি বলে, ‘‘আমার বয়েই গেছে তোকে আদর করতে।’’

হেসে ফেলে স্বর্ণাভ, ‘‘আচ্ছা চল ছাড়লাম। টিকিটগুলো মেলে পাঠিয়ে দিয়েছি তোকে।’’

ফোনটা রেখে নিজেই হেসে ফেলে সুচি। মনে মনে ভাবে অকারণেই অভিমাণ করে ও। স্বর্ণাভর থেকে প্যাম্পার হতে ভাল লাগে ওর।

হঠাৎই স্বর্ণাভর বলা একটা শব্দ মাথায় ক্লিক করে যায় তখন বোধগম্য হয়নি। ও বলেছিল, ‘‘একটা গুড নিউজ দেব এসে।’’

অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে ফোন করে সুচি।

স্বর্ণাভ, ‘‘বল।’’

সুচি, ‘‘কী গুড নিউজ দিবি বললি তখন।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘বাব্বা, ম্যাডামের এত ক্ষণে সম্বিত ফিরেছে। তাই তো ভাবছি কোনও প্রশ্ন নেই কেন?’’

সুচি, ‘‘ভনিতা না করে বল।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘বললাম যে এসে বলব। একটু অপেক্ষা কর না বাবা।’’

কথা বলতে বলতেই মেট্রো স্টেশনে ঢুকে পড়ে সুচি। ফোনটাও কেটে যায়। নানা হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছয় ও। টিপটপ করে সাজানো ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট। সুচি নিজেই রান্না করে, ঘরের যাবতীয় কাজও ওরা দু’জনে

সামলায়। নিজেদের এই একান্ত ব্যক্তিগত জায়গাটায় বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ।
ফ্রেশ হয়ে, এক কাপ কফি নিয়ে টিভিটা খুলে বসে। বাড়ি ঢুকে স্বর্ণাভকে টেক্সট করে দিয়েছে। স্বর্ণাভ এখনও অফিসে রয়েছে। এটা ওদের প্রেমের শুরু থেকেই অভ্যেসে ঢুকে পড়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, ওরা যখন একসঙ্গে থাকে না তখন, দু'জনের কাছেই দু'জনের আপডেট থাকে সব। তাতে ওদের মেল, ফিমেল কোনও ইগোই হার্ট হয় না। ওরা সমর্পণে বিশ্বাসী।
এর মধ্যে নচিকেতার সঙ্গেও কথা বলা হয়ে গিয়েছে স্বর্ণাভর। অনুষ্ঠানের দিন প্রোগ্রাম শেষ করে সরাসরি এ বাড়িতে আসবে নচি, সেটা নিশ্চিত করেই ফোন করেছিল সুচিকে। সে দিন সুচি অফিস যাবে না আগে থেকেই জানিয়ে দেবে। এক তো রান্না করতে হবে। তার উপর সকালে স্বর্ণাভ ফিরবে। এয়ারপোর্টেও যেতে হবে। যত বার ও বাইরে যায়, ফেরে— এয়ারপোর্টে সুচি থাকে।

অনুষ্ঠানের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ম্যানহাটনের বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনেও উৎসবের মেজাজ। সুচি এখনও যাওয়ার সময় করে উঠতে পারেনি। কাল বস্টন থেকে লস এঞ্জেলেস যাবে স্বর্ণাভ। ক'টার ফ্লাইট যেন? মেলটা খুলে দেখে সুচি। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সকাল ৭.৫৯-এ বস্টনের লোগান বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে। ভাবতে ভাবতেই স্বর্ণাভর ফোন আসে।
স্বর্ণাভ, ''শোন কাল সকাল ৫টায় এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে তাই শুয়ে পড়ছি।''
সুচি, ''হোটেল থেকে বেরিয়ে ফোন করবি।''
স্বর্ণাভ, ''তোর ঘুমটা শুধু শুধু ভাঙবে। বরং ফ্লাইট ছাড়ার আগে করব।''
সুচি, ''যা বললাম তাই করবি। তর্ক করিস না।''
স্বর্ণাভ, ''ওকে, করব। আর ঝগড়া করিস না। মাত্র কয়েকটা দিন পরই তোর সঙ্গে দেখা হবে। তখন সামনাসামনি করিস।''
সুচির অবশ্য ঘুম আসে না। কখন ফোন আসবে, যদি শুনতে না পায়, এই ভেবে।
ভোর চারটে নাগাদ সুচির ফোনটা বেজে ওঠে। একটা রিং হতেই ফোন ধরে ও।
স্বর্ণাভ, ''ঘুমোসনি নিশ্চই? জানতাম। না ঘুমোলে তোর শরীর খারাপ হয় জানিস। ফোন করব বললাম তা-ও জেগে থাকলি?''
সুচি, ''ঘুম আসছিল না। তোকে খুব মিস করছি।''
স্বর্ণাভ, ''আর তো ক'টা দিন, একটু অপেক্ষা কর। তোর কাছেই আসব।''
সুচি, ''হুমম....''
স্বর্ণাভ, ''হুমম...! জানিস না আমার এটা পছন্দ নয়।''
সুচি, ''সে তো হোয়াটসঅ্যাপে লিখলে রেগে যাস। বললেও রাগ হয় জানতাম না তো?''
স্বর্ণাভ বুঝতে পারে, সুচি ওকে ইচ্ছে করে রাগাচ্ছে, ''এ বার ঘুমো। ফ্লাইট ছাড়ার আগে ফোন করব।''
সুচি, ''না, কথা বল।''
স্বর্ণাভ, ''আচ্ছা ভাল কথা, এ বার পুজোয় কলকাতা যাবি তো? তা হলে টিকিট কাটতে হবে, না হলে দাম প্রবল বেড়ে যাবে।''
সুচি, ''হ্যাঁ, তুই ফের, বসে প্ল্যান করে নেব। কত দিন দার্জিলিং যাইনি। এ বার কিন্তু দার্জিলিং যাব। দার্জিলিং মেলে করেই যাব।''
স্বর্ণাভ, ''যাব তো বটেই। হোটেলটাও দেখে রাখ। বাড়ির কেউ যাবে কি না জেনে নিস।''
ঘোরার প্ল্যান করতে করতেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে যায় স্বর্ণাভ।
স্বর্ণাভ, ''চেক-ইন করে নিয়ে আবার কল করছি। ঘুমোবিই না যখন তখন অপেক্ষা কর।''
সুচিকেও অফিসে ঢুকতে হবে আটটার মধ্যে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোর পাঁচটা। সাতটায় বেরোয় ও। উঠে এক কাপ গ্রিন টি বানিয়ে নিয়ে বেডরুমে আসে। চেক-ইন করে একটা লার্জ কফি নিয়ে লাউঞ্জে বসে সুচিকে ফোন করে স্বর্ণাভ।
সুচি, ''কফি খা একটা।''

স্বর্ণাভ, ‘‘কিনেছি। কাফে লাতে।’’

সুচি, ‘‘আমিও চা বানালাম।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘আজ কী ভাবে অফিস করবি তুই, একটুও ঘুমোলি না যে?’’

সুচি, ‘‘ও ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি চলে আসব।

স্বর্ণাভ, ‘‘প্রোগ্রামের টিকিটটা বলে রেখেছিস তো?’’

সুচি, ‘‘হ্যাঁ...’’

স্বর্ণাভ, ‘‘সে দিন কী মেনু করবি ভেবেছিস কিছু?’’

সুচি, ‘‘তুই বল।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘দাদা বিশেষ স্পাইসি খাবার খায় না।’’ নচিকেতাকে ও দাদা ডাকে।

সুচি, ‘‘তা হলে একটা চিকেন স্যালাড বানাই। সঙ্গে ব্রেড, স্যুপ। আর রাইস আর চিকেনও রাখি অল্প করে। যেটা খায়।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘এটাই ভাল হবে। তোর ফাটাফাটি চিকেন স্যালাড দাদার পছন্দ হবে। আচ্ছা অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। সিটে বসে ফোন করছি।’’

কথা বলতে বলতেই অফিসের জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছে সুচি। ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে ছ'টা তখন। চট করে স্নানটাও সেরে নিয়েছে। কারণ, স্বর্ণাভর যখন ফ্লাইট টেক-অফ করবে তখন ও মেট্রোতে থাকতে চায় না। তাই একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। মোবাইল বন্ধ করার আগে স্বর্ণাভর যখন ফোন আসে তখন ও অফিসের লিফটের সামনে।

স্বর্ণাভ, ‘‘শোন এ বার মোবাইলটা বন্ধ করতে হবে। তুই ঢুকে গেছিস অফিসে?’’

সুচি, ‘‘হ্যাঁ, ঢুকছি। তোর ফোন ছেড়েই লিফটে উঠব।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘লস এঞ্জেলেসে নেমে ফোন করব।’’

সুচি, ‘‘ঠিক আছে। সাবধানে যা।’’

স্বর্ণাভ মজা করে বলে, ‘‘আমি আর সাবধানে যাব কী করে, পাইলটকে বলতে হবে তা হলে যাতে সাবধানে চালায়।’’

সুচি, ‘‘মজা করিস না, এটা একটা কথার কথা। ফ্লাইটে কিছু খেয়ে নিস।’’

স্বর্ণাভ, ‘‘ঠিক আছে... বন্ধ করলাম। টাটা।’’

সুচি, ‘‘টাটা।’’

সুচির মোবাইলের স্ক্রিনে ওদের দু'জনের হানিমুনের একটা ছবি রয়েছে। এত বছর হয়ে গিয়েছে, ওটা বদলায় না ও। এ বার দার্জিলিং থেকে ফিরে বদলাবে স্বর্ণাভকে কথা দিয়েছে। আর স্বর্ণাভর মোবাইলে ওদের বিয়ের ছবি। মোবাইলটা বন্ধ করার আগে ছবিটা আর এক বার দেখে স্বর্ণাভ।

সঠিক সময়েই ফ্লাইট ছাড়ে। কাজে মন দেয় সুচিস্নেতা। সারা রাত না ঘুমিয়ে বেশ কষ্টই হচ্ছে। এক কাপ স্ট্রং কফি নিয়ে বসে। কলকাতার টিকিটটা দেখতে বলেছিল স্বর্ণাভ। মেকমাইট্রিপ খুলে টিকিট চেক করতে থাকে সুচি। কাজে মন নেই। যদিও স্বর্ণাভ ম্যানহাটনে আসছে না। কিন্তু কোথাও একটা কাছে আসার অনুভূতি হয় সুচি।

স্বর্ণাভর বিমান টেক-অফ করার কিছু ক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা টের পেয়ে গিয়েছিল বিমান হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে। স্বর্ণাভর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে সুচির কষ্টে জর্জরিত মুখ। অতিরিক্ত ভাবার অভ্যেসবশত স্বর্ণাভ ধরেই নিয়েছিল, ওর আর সুচির কাছে ফেরা হল না। মনে মনে ক্ষমা চায় নিজের ভালবাসার কাছে। বিমানের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকে।

ডেস্কের পাশের বিরাট কাচের জানলার বাইরে পুরো ম্যানহাটন শহরটাকে সময় পেলেই চেয়ে দেখে সুচি। ৯৯ তলা থেকে শহরটাকে লিলিপুটের দেশ মনে হয়। অন্ধকার নামলে যখন আলোর মালায় সেজে ওঠে গোটা শহর, তখন কেমন একটা মায়াবি লাগে। সব রকম ভাবে ওই আকাশছোঁয়া অফিসঘর থেকে ওর শহরটাকে দেখতে দারুণ লাগে। তার উপর দিয়ে কত বিমান উড়ে যায় শব্দ করে, কত ঠিকানায়। আজ যেন বড্ড নীচে দিয়ে যাচ্ছে। একটু অবাক হয় সুচি। নীচে লিলিপুটের দেশের কাছে যেন এই বিমান আস্ত একটা রাক্ষস। গিলে ফেলবে গোটা শহরটাকে। ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে সুচির দিকে।

ভয় পায় না সুচি। স্বর্ণাভকে অনুভব করতে পারে ও। মনে হয় যেন খুব কাছে কোথাও রয়েছে। চোখ বুজে ফেলে সুচি। মোবাইলটাকে বুকে চেপে ধরে স্বর্ণাভ।

উপত্যকা সংবাদ

উজ্জ্বল

টুপুরের গা-টা বেশ গরম। বিকেল থেকেই জ্বর জ্বর লাগছে। মাথাটাও প্রবল ভার। সেই ভারী মাথাটাকে এই মাঝ রাতে শরীরের বোঝা বলে মনে হচ্ছে ওর। কেটে ফেললে ভাল হত!

রোশনকে নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা তখন থেকে সেই মাথাতেই ঘুর ঘুর করে যাচ্ছে। টুপুর কিছুতেই সরিয়ে ফেলতে পারছে না। সরাতে যেমন পারছে না, তেমন সেটাকে পজিটিভ কোনও খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক জোরও পাচ্ছে না ও।

আজ ঠিক তেইশ দিন। রোশনের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। কথা তো অনেক দূর, রোশনরা কেমন আছে, কোথায় আছে, কী করছে, আদৌ বেঁচে... হ্যাঁ ঠিক এখানটাতে এসেই চিন্তার পিনটা কিছুতেই আর সরছে না। এখানটাতেই এসে আটকে যাচ্ছে... আদৌ বেঁচে আছে তো!

এমনিতে টুপুর যে খুব নেগেটিভ চিন্তাভাবনা করে, তা কিন্তু মোটেও নয়। বরং হাসিখুশি। ওই যে কথায় বলে না, বিন্দাস, হ্যাঁ ও একদম ওই দলেই পড়ে। পড়ে, নাকি পড়ত? গত তেইশটা দিন ওর যে ভাবে কেটেছে বা এখন এই মাঝরাতও কাটছে, সে টুপুর ছাড়া আর কে-ই বা জানে!

সোদপুরের এই দু'কামরার ফ্ল্যাটের বাইরে টুপুরের একটা জীবন আছে। বন্ধুদের ইন্দিরা। ইন্দিরা সেনগুপ্ত। বঙ্গবাসী পেরিয়ে সবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মাস কমিউনিকেশন এবং জার্নালিজম বিভাগ। বাংলা করলে কেমন একটা শোনায়! তাই টুপুর কারও কাছেই বাংলাটা বলে না। বর্তমানে ওর আদর্শ বরখা দত্ত। তাঁকে দেখেই জার্নালিজম পড়তে আসা। কার্গিল কভারের সেই ভিডিয়োগুলো টুপুর ইউটিউবে দেখেছে। এ ছাড়া বরখার নানা শো! উফ কী ভাল যে কথা বলেন ভদ্রমহিলা! সাংবাদিকতা করতে হলে হয় বরখা, না হলে এই প্রফেশনে থাকারই কোনও মানে হয় না। এ ব্যাপারে টুপুরকে ক্রেজি বললে ওর কোনও আপত্তি নেই। তো যাই হোক, তেইশ দিনের এই ইতিবৃত্তের কিছুটা সোমশ্রী জানে। ইন্দিরাকে সে একটু সাহস দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু, টুপুর সে ভরসাকে মোটেও গুরুত্ব দিতে চায় না। টুপুরের এই দুশ্চিন্তার একটা বড় কারণ, রোশনের শেষ টেক্সট। ইংরেজিতে সেখানে লেখা ছিল, 'কিছু একটা খারাপ ঘটনা ঘটতে চলেছে। কী সেটা কিছুতেই আঁচ করতে পারছি না। তবে কিছু যে একটা হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত।'

ক্লাসে ছিল বলে দুপুরে আসা মেসেজটা টুপুর বিকেলে দেখেছিল। পরে জবাব দিতে গিয়ে দেখে রোশনের কাছে টেক্সট যাচ্ছে না। এর পর থেকে আর রোশনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। আজ তেইশ দিন। মেসেঞ্জারে মেসেজ পাঠালে একটা টিকও ভরাট হচ্ছে না। ফোন করলে পিক-পিক আওয়াজ। তার পর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। একটা সময়ের পর কল আপনা থেকেই কেটে যায়। আদৌ বেঁচে আছে তো! ভারী মাথায় এই একটা প্রশ্ন বারে বারেই ঘুরে ফিরে আসছে।

এখন অনেক রাত। মোবাইলটা নিয়ে লাস্ট পাঠানো মেসেজটা ডেলিভার্ড হয়েছে কি না আরও এক বার দেখে টুপুর। তার পর ফের ফোন। এবং এ বারও পিক... পিক... পিক...

টুপুরের এ বার জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। ভীষণ কান্নাও পাচ্ছে। কিন্তু, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। একটা অদ্ভুত কষ্ট কেমন যেন বিঁধে রয়েছে ঠিক পাঁজরের কাছটায়। সরছেই না। আদৌ বেঁচে আছে তো! উফস্! মাথা থেকে এটা যাচ্ছেই না! জ্বর গায়ে টুপুর অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। মাঝে মাঝে চুল টেনে বৃথা চেষ্টা করতে থাকে মাথাটাকে আলাদা করার।

রোশন। রোশন আহমেদ কুরেশি। কাশ্মীর থেকে এসেছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে। ওর বাবা প্রতি বারই এই সোদপুরে কাশ্মীরি পসরা নিয়ে আসত। যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, টুপুর তবে থেকেই মনে করতে পারে ফারুককাকাকে। হ্যাঁ রোশনের বাবাকে টুপুর ওই নামেই ডাকে। টুপুরদের উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের গৌতমকাকুরা যখন উপরের আরও বড় ফ্ল্যাটে চলে গেল, তার পর থেকে ফারুককাকা ওই ফ্ল্যাটেই এসে থাকত। অক্টোবরে আসত। আবার মে-তে চলে যেত। তো এবার ফেব্রুয়ারিতে ওর বড় ছেলে রোশন চলে এল হঠাৎ। পরীক্ষা শেষ। তাই বাবার কাছে ঘুরতে এল। এটা ফারুককাকা বলেছিল। কিন্তু রোশনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর টুপুর জেনেছিল, পুলওয়ামা হামলার পর ফারুককাকা ওকে নিয়ে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই ছেলেকে এখানে নিয়ে আসে। ভয়টা কেন, সেটা বলেনি রোশন।

শ্রীনগরের অমর সিং কলেজ থেকে রোশন সদ্য পাশ করেছে। সায়েন্স গ্রাজুয়েট। ফারুককাকা সেই সময় টুপুরকে বলেছিল, ''আমি আর ক'বছর! এর পর থেকে তো ওকেই আসতে হবে। এখানকার ব্যবসাটা তো আর বন্ধ করে দেওয়া যায় না! এ বার ফিরে গিয়ে ডাল লেকের দোকানেও রোশনকে নিয়ে বসব।''

কিন্তু রোশনের যে ব্যবসায় কোনও মন নেই, সেটা টুপুর সেই দিন বুঝে গিয়েছিল, যে দিন ও কাশ্মীরি ওই কিশোরকে ওদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। মন যে আসলে কীসে, সেটাও রোশন স্পষ্ট করেনি। তবে, এ সব আলাপচারিতায় টুপুর মনে মনে বেশ টের পেয়েছিল, রোশন অদ্‌ভুত স্নিগ্ধ এক ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকেই ওরা দু'জনে ট্রামে চেপে ধর্মতলা গিয়েছিল। কাশ্মীরি কিশোরকে কলকাতা দর্শন করানো আর কি! তা-ও এপ্রিলের কাঠফাটা দুপুরে। তত দিনে ওদের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। অনেক বিষয়েই কথা হয়েছে। তো টুপুর সে দিন ট্রামে যেতে যেতে রোশনকে নিজের ভবিষ্যৎ-ইচ্ছের কথাও বলেছিল। ও সাংবাদিক হতে চায়। বরখা দত্তের মতো। যুদ্ধ কভার করা সাংবাদিক। খুব স্বপ্ন। এমনিতেই গরমের দুপুরে লালচে হয়ে যাওয়া মুখ রোশনের। টুপুরের কথায় সেই লাল মুখ যেন হাঁফরের হাওয়া পাচ্ছিল। যেন আগুনে পুড়ছে লোহা! ঠিক সেই মুহূর্তে রোশনের বলা কথাটা খুব কানে বাজছে আজ টুপুরের: ''ফিল্ম কে সিবা আপনে কভি ওয়ার দেখা হ্যায়? মিলিটারি? সিআরপি? পুলিশ?'' কথাগুলোর মধ্যে এতটা জোর ছিল, টুপুর কোনও উত্তর দিতে পারেনি। চুপচাপ ওই কিশোরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ধর্মতলা যাওয়ার পথে আর কোনও কথা হয়নি। ফেরার সময় ওরা মেট্রো ধরেছিল। পাশের সিটে বসে রোশন একটা সময় আলতো ভাবে বলেছিল, ''বুরা মত মানো। তুম যব শ্রীনগর আওগে, তব তুমহে ম্যায় শিকারা চড়ায়েঙ্গে। কাশ্মীর বহত সুন্দর হ্যায়। তুম উধার ইউ হি আনা। মেরে ঘর। লেকিন কভি ওয়ার কভার করনে কে লিয়ে নেহি। তুমনে দেখা নেহি। হম হর রোজ ওয়ার দেখতে হ্যায়।''

টুপুরের মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। না বুঝেই ও রোশনকে খুব কষ্ট দিয়ে ফেলেছে, সেটা বুঝতে পেরেছিল। তার পর রোশনের চলে যাওয়া পর্যন্ত কোনও দিন ওর সামনে এ সব কথা আর বলেনি। কোথাও রোশনের খারাপ লাগাটা চারিয়ে গিয়েছিল সে দিন টুপুরের ভিতরেও।

সে দিন রোশনকে বলেছিল টুপুর, ওদের বাড়িতে যাবে এক বার। থাকবে। ঘুরবে। বেশ মজা হবে। কোন কোন জায়গা ঘোরাতে নিয়ে যাবে রোশন, সেটাও ওই দিন প্ল্যান করে ফেলেছিল ওরা। লিস্টের প্রথম দ্রষ্টব্য স্থানটা শুনে টুপুরের খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু রোশনের খারাপ লাগতে পেরে ভেবে ও আর কিছু বলেনি। সেটা ছিল, অমর সিং কলেজ!

কথাটা ভেবেই এই মাঝরাতে টুপুরের হাসি পেল। মুহূর্তে মিলিয়েও গেল হাসিটা। আবার সেই প্রশ্নটা মুছিয়ে দিল হাসি, ও বেঁচে আছে তো আদৌ! হয়তো এই আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। সব ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু...

আসলে সে দিনের পর থেকে রোশনের প্রতি একটা অন্য রকম অনুভূতি কাজ করছে টুপুরের। সেটা ও ভাল মতো বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু, আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। সোমশ্রীকে বলার চেষ্টা করেছে। সে তো এক কথাতেই নাকচ! ''ওরে কোনও অনুভূতি রাখিস না ইন্দিরা মা আমার। মুসলমান। তার উপর আবার কাশ্মীরি! প্রাণটা বেঘোরে যাবে। কাকু-কাকিমার কথাটা ভাব! ওর থেকে আমাদের অরুণাভ অনেক ভাল রে। তুমি ওর প্রতি একটু অনুভূতিটা বাড়াও, কাজে দেবে,''— এটা ছিল সোমশ্রীর ফার্স্ট রিঅ্যাকশন। তার পর থেকে সোমশ্রীকে এ নিয়ে কিছু বলেইনি টুপুর।

সে দিনের টেক্সটটা পাওয়ার পর থেকে যখন আর রোশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, এমন অবস্থায় তিন-চার দিন কাটিয়েছে টুপুর। খবরের কাগজ, ওয়েবসাইট, টিভি— সব কিছুতে নজর রেখেছে। প্রথমে খবর আসছিল, উপত্যকায় আধাসেনা বাড়ানো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। জঙ্গি হামলা হতে পারে এই আশঙ্কায়। টুপুর তখন মেলানোর চেষ্টা করে, এই কথাটাই কি টেক্সটে বোঝাতে চেয়েছিল রোশন— 'কিছু একটা খারাপ ঘটনা ঘটতে চলেছে। কী সেটা কিছুতেই আঁচ করতে পারছি না।'

যদি তাই হয়, তা হলে আঁচ করবে কী করে! গোটা দেশই তো সেটা জানল আরও কয়েক দিন পর। তত দিনে উপত্যকার সঙ্গে বাকি দেশের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। না ফোন, না ইন্টারনেট— একেবারে বিচ্ছিন্ন। মানুষগুলো কেমন আছে? কেউ জানে না। সংবাদমাধ্যমও ঠুঁটো! কোনও খবরই তো পাঠক অবধি পৌঁছচ্ছে না! টুপুর এই জ্বরের ঘোরেও হাল্কা করে নিজেকে বোঝাতে থাকে, সাংবাদিকরাও আসলে স্বাধীন নয়। তাঁদেরও অনেক ক্ষেত্রে হাত-পা বাঁধা!

এ ভাবে উত্তেজনার তেইশ দিন আজ। কয়েক দিন ধরে শরীরটা আর দিচ্ছে না, দিচ্ছে না ভাব। তার চেয়েও বড় কথা, মনটা একেবারে ভাল নেই। এখন তো টুপুর প্রায় ধসে পড়েছে। বাবা-মা কিছু একটা আঁচ করছে। কিন্তু টুপুর কিছু বলেনি। কয়েক দিন ধরে কাশ্মীরের খবর কিছু কিছু আসছে। কিন্তু, রোশন এখনও অধরা। টুপুরের বিশ্বাস,

রোশনও ওকে চেষ্টা করছে। কিন্তু, সব কিছু বন্ধ করে দিলে ও বেচারাই বা কী করবে!
টুপুর এই মাঝরাতে ফের এক বার ডায়াল করে রোশনের নম্বরে। পিক... পিক... পিক... তার পর অনন্ত নীরবতা। কেটে যায়।
রাত কত কে জানে। খাটেই একটু এলিয়ে পড়েছিল টুপুর। হঠাৎ মোবাইলের শব্দ। মাথাটা কেমন চক্কর কেটে উঠল। ঘোরের ভেতরেও ও নিশ্চিত, এটা রোশনের ফোন। এলিয়ে পড়ার সময় মোবাইলের স্ক্রিনটা উল্টে গিয়েছিল বোধহয়। স্ক্রিনটা সোজা করে দেখে, সোমশ্রী ফোন করেছে। এত রাতে!
টুপুর এ পাশ থেকে হ্যালো বলতেই সোমশ্রী, ''সরি ইন্দিরা, এত রাতে ফোন করার জন্য! হ্যাঁ রে কাশ্মীরের ওই ছেলেটার নাম কী রে? আই মিন রোশনের পুরো নামটা কী?'' শব্দগুলো ঝড়ের বেগে বলে গেল ও।
টুপুরের জ্বোরো মাথা কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু রোশন শব্দটাই ও শুনল। ''আবার বল কী বললি? কিছুই বুঝলাম না?''—টুপুর ফের জিজ্ঞেস করে।
—রোশনের পুরো নাম কী?
—কেন? কী হয়েছে? বল কী হয়েছে?
—নামটা আগে বলবি তো!
—রোশন। রোশন আহমেদ কুরেশি। বয়স ২০। বাবার নাম ফারুক আহমেদ কুরেশি। বাড়ি শ্রীনগর, ফতেহ কাডাল। কী হয়েছে বল। প্লিজ বল। প্লিজ।
— তোকে একটা হোয়াটস্অ্যাপ করেছি। খবরের লিঙ্ক। পড়ে দেখ।
ফোনের লাইনটা নিজেই কেটে দেয় টুপুর। আঙুল চাপে হোয়াটস্অ্যাপে। সোমশ্রী একটা সর্বভারতীয় ওয়েব পোর্টালের লিঙ্ক পাঠিয়েছে।
খুলতেই ভেসে ওঠে হেডলাইন: 'ইটস আ মিরাকল দ্যাট হি ইজ অ্যালাইভ!'
তার পর একটা ছবি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালে বেডে শুয়ে একটা ছেলে। ঘাড়ে, কাঁধে, মুখের এক পাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাতে-নাকে-মুখে একাধিক নল। এই তো রোশন। কী হয়েছে ওর? কী হয়েছে? টুপুর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে থাকে। কিন্তু জবাব দেবে কে? সামনেটা ঝাপসা হয়ে আসে। কোনও রকমে টি-শার্টের লম্বা হাতায় চোখ দুটো মুছে নিয়ে খবরটা পড়ার চেষ্টা করে টুপুর।
ফর দ্য পাস্ট থ্রি ডেজ, টোয়েন্টি ইয়ার ওল্ড রোশন আহমেদ কুরেশি ফ্রম ফতেহ কাডাল লোকালিটি অব শ্রীনগর, দ্য ক্যাপিটাল সিটি অব কাশ্মীর, হ্যাজ বিন ব্যাটলিং ফর হিজ লাইফ অ্যাট শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। ''দ্য পেলেটস হ্যাভ মেড আ ডিপ উন্ড অন দ্য লেফ্ট সাইড অব হিজ নেক,'' সেইড আ ইয়ং ডক্টর হু ওয়াজ অন ডিউটি ইন দ্য হসপিটালস ওয়ার্ড নম্বর টু। ''সাম পেলেটস হ্যাভ পাংচারড দি আউটার সারফেস অব হিজ স্টমাক অ্যাস ওয়েল,'' দ্য ডক্টর কন্টিনিউড। হি অলসো সেইড, ''পেলেটস আর স্টাক ইন হিজ ফেস, হেড, নেক অ্যান্ড শোল্ডার। ইট ইজ আ মিরাক্যল দ্যাট হি ইজ অ্যালাইভ!''

"Are you working ?"..... and other pet peeves

Manjoori Ganguly

Yo all you married ladies and mothers! Recognize this question?? I can't stop counting the number of times this question has been thrown at me, especially post marriage and super-queerly, post motherhood. Here I was, with my one-year-old in the perambulator and once the social pleasantries and the cootchie-cooing with the infant was dispensed with, I received this smasher, "So, are you working?"

I love to stick the quizzical expression of a chimpanzee on my face, which is a mix of ignorance, innocence and impatience, feigning total loss of comprehension, when faced with this question. I waited for her to simplify it further…, "So, are you a working mom?"

Me, silent, passive-aggressive script in my head :

No sweetheart, I just stand there with a smile on my face, chant the magic spell and wave my magic wand… and things in the house just get done. Duh!

I say, "Show me a non-working mom and I'll show you a pig that flies!"

Has anybody stopped to wonder about the redundancy of the term "working mother"? I know the term was coined to refer to a woman who has children and is either self-employed or has a 9- to-5 job that pays her a salary but how can you just tick off and imply that a stay-at-home mom is "non-working" just because she doesn't get a pay-check at the end of the month? Show me a mother of an infant who doesn't work under constant stress trying to keep the baby bathed and fed, diapers changed, putting a colicky infant to bed on time, keeping doctors appointments…all this and she still asks for no sick or privilege leaves. Find me a mother of a school going kid who doesn't get her child's breakfast ready, lunch packed, homework in place, laundry done, clothes ironed and also attends PTA meetings and backyard parties and picnics. A mother goes through the rigours of driving her kids to soccer practice and piano recitals and in turn gets driven up the wall and round the bend by them. She battles with her teenagers and their hormones running amok in the house while she calmly manages sleepovers, television times and messy bedrooms. She continues cooking for the adult son, who should have long since left home and ventured out on his own but stayed behind to look after his parents, taking care of his laundry, entertaining his girlfriend, digging into her family history and dodging questions about his marriage plans from curious friends and relatives.

A mother, you see, never stops working, never complains of "burnout" and she never gets paid in green dollars or Euros or Rupees.

So here's some advice for those who cannot resist posing this question to women: Get informed. If the lady has a kid, do not ask the obvious. "Are you working?" is going to get a flying saucer or a dirty diaper aimed at you.

Then there are the insensitive geniuses who believe they have conquered the world because they sit in a 4x4 cubicle writing inter-office memos and earning five-digit salaries and think it is their moral duty to point out to me what a sinful life I have led so far, when they accusingly lay it out in the open, "Tsk Tsk tsk, you actually wasted a seat in that management institute. After spending two years on the program, you became a housewife! One person could have studied and utilized that seat".

Yes Darling, you see, I was in the midst of the most vindictive phase of my life and for my own sadistic pleasure I decided to get enrolled into a Post Grad Program in Management and then do nothing at all just to deprive the next person in line of a possible education. God knows it felt so good, you should try it too, it is therapeutic you know. I actually quite excel in these kinds of "seat-deprivation" occupations and am currently writing a "How To" book on it Sir!

I mean, how much of that sterile intelligence is required to figure out that a woman decides to be a stay-at-home mom because she has a reason to do so? This is not something you foresee as a student at the age of 20 when you declare, "Mom, Dad, I am going to get a Management / Engineering/ Architecture degree because I so want to sit home and do nothing after I get married. It is so exciting to "waste" a seat and ruin another person's chance of doing something worthwhile for this country!"

However, more than anything else, what gets my goat - and not just my goat but all the other animals in my farm, is the use of the word "waste". How can any education be wasted…even if you choose to be a home-maker? (It is politically incorrect to call wives who choose not to pursue a career outside of the house, to be addressed as housewives. That is as degrading as calling a public servant a servant. Ouch!) Test a wife on Personnel Management and she'll rattle off the names of her maids, the chauffeur, the cook, their pays, their families, the number of days of leave they are permitted to take…all of it. Ask her about Inventory Management and she'll tell you exactly when sugar needs to be purchased, how much fish lies in the freezer and which grocer is selling rice cheaper and which greengrocer has been cheating with their weighing scales! She who goes around the market checking out the best buys, the most economic sources of fresh fruits, the wholesale markets for bulk purchases cannot be challenged in the Marketing or Vendor Development areas either. Accounting and Financial Management, you ask??? Everything from the pearl set around her neck to the fresh fruit on your table, the evening snack of samosas and jalebis to the expensive sari for mother-in-law's birthday duly accounted for and managed within the salary. In fact, street smart management techniques originate from the home-maker's strategies to run a household. So, don't tell me about "wasted" seats, because

the only seats that I see wasted are the ones inside those expensive designer trousers and which ought to be hung from a clothes-line on a hot summer afternoon in the Sahara with its owner inside it!

Do I even dare start on my old Polish neighbor who is curious to know why I have just one son and not any more, as translated for me from the original Polish by her severely embarrassed daughter? Well, at least I don't miss the matronly, "just one bowl sugar"-borrowing, friendly neighborhood (no, not Spiderman!!) aunty who, I suspect was not as much interested in borrowing the sugar as she was in knowing about any possible progenies after my only son. Sorry to disappoint you ladies, but it is curtains down on this

Anusha

6 chapters

Tridibesh

Chapter 1 :

Pujo manei prem

On Shasthi evening, they see each other for the first time @ Singhi Park and fall in love at the first sight, no conversation albeit.
On Saptami evening, they meet each other at Mudiali by sheer serendipity and introductory conversations kick start.
On Mahasthami evening, they meet each other with intent at Maddox square and the coyish love starts brewing up in the scent of saree and dhoti-kurta.
On Nabami night, love intensifies at Peter Cat in the delicious company of Chelo Kebab and Sizzler.
On Dashami night after the immersion of Maa Durga, she bids adieu to him and says...

“আসছে বছর আবার হবে, যেখানে শেষ হলো এবার, সেখান থেকেই শুরু হবে আবার। ..
চল, করে রাখি আমাদের প্রেম তা only পুজো special !”

(Translated in English : we will meet again next year in Durga Puja, we will start our conversations exactly from where we have left... let's keep this love reserved only for Durga Puja..let's keep it Puja special..)

¤¤

Chapter 2:

Pujo manei aabeg

Just as Ayon took the first sip of his early morning tea from a roadside tea stall of a nondescript narrow lane in Kumartuli,
he lifted up his chin to see a silhouette of a woman, coming out of the shroud of morning fog with a certain poise in slow motion, perfectly draped
in a lal paar shaada saree (traditional bengali saree).
She comes close to him, winks at him, titillates him with her obtrusive sensuality and gives a quaint smile at his boyish nervousness.
" Ey babu, ayega kya meri haveli pe.." she asks.
" Joy Maa Dugga, durgotinashini.." , saying this he sat down on his knees and touched her feet to seek her blessings.
Ayon could sense that she was no one but Maa Durga herself in the garb of a পতিতা.

¤¤

Chapter 3 :

Pujo manei license pawa

Punjabi wife & Bengali husband from Kolkata.

"Sign a contract now that you would not check out any other woman in your life apart from me" - the insecured wife scoffs at her flirty husband.
"Sure, of course..I promise..I won't..but the violation of the contract is likely to happen only during Durga Puja" - the husband quips.
"Whyyyyyyy....???" - the wife frowns at him.
" Because Bengali women in saree during Pujo is a complete visual treat..ahaaaa...uffff...amar bongo naari..." - he cites the reason.
"Ohk, then I will also check out handsome bengali men..." - she says , lifting up her shoulder.
" Yaa, absolutely..why not..but only during Durga Pujo kintu.." - he says with a certain insecurity in his voice.

¤¤

Chapter 4 :

Pujo manei ghore fera

Bangalore,

Sanchita's daunting boss was not granting her the leave for coming to Kolkata during Durga Pujo.
She even said that she would do 'work from home' and manage the presentation with the client.
Still he was not complying with her.
'What do u want, Sanchita...tell me...this stupid Durga Puja or this job ???'- he asked her.
'Ofcourse Durga Pujo...and with that.. a better boss for my next company' - she says on his face and leaves the room.
She put down the paper on that day itself and then.............Kolkata....

Seeing the familiar sight of Maa Durga vanquishing the demon, Sanchita wished if she could do the same thing to her boss..she almost imagined a fight sequence where she
is dressed up as Maa Durga and her boss in the avatar of demon / oshur.

¤¤

Chapter 5 :

Pujo manei eksathe khawa

a BMW stops at the entrance of a 5 star hotel, the driver opens the door of the car,
Dr Sen and his family get down and enter the hotel.
Few minutes later at the restaurant, Dr.Sen's 6 years old grandson Adi throws a query to everyone on the table.

" Why Samir da is not eating with us over here...he is also family...Samir da ke dako...oke dako..call him..." - the 6 year old opens everyone's eyes in the family.
Samir da, their age old driver, who was sitting all alone in the parking lot , gets completely taken aback when he sees the whole family has come to him.
' Ki hoyeche boro babu...apnara shobai uthe elen naa kheye..." - he asks in bewilderment.

'Samir da, tumi amader sathe khabe ...cholo, Samir da..cholo...noto dugga thakur raag korbe...'
- the kid shuns all the narrow barriers of class discrimination, so easily.

<u>Chapter 6</u> :

Pujo manei Birendra Krishna Bhodro

Samaresh has admitted his 92 year old mother to a nearby hospital as her condition is critical.
Doctors have already stated that her days are numbered.
Durga Pujo is in the offing, only a month left.
" Samaresh, I don't think i will be able to see this year's pujo.." - She says in a shaken voice.
" Maa, please don't say all these...everything will be fine..." - the son consoles her ailing mother.
" Samaresh, can you do one favor for me right now ? " - she asks.
" Yes, Maa..tell me..." - he replies steadily.
" Samaresh, I want to hear Mahalaya right now, that would be my last wish...I would die listenig to Birendra Krishna Bhodro..make it happen.." - She starts gasping.

Samaresh plays the untimely Mahalaya on his laptop and as Birendra Krishna's voice reverberates through her mother's feeble wrinkled ears, she happily breathes her last.
It is 10 pm in the clock, a month left for Durga Pujo but Birendra Krishna's voice in the background has already given an advance call to the nature that Pujo has arrived.

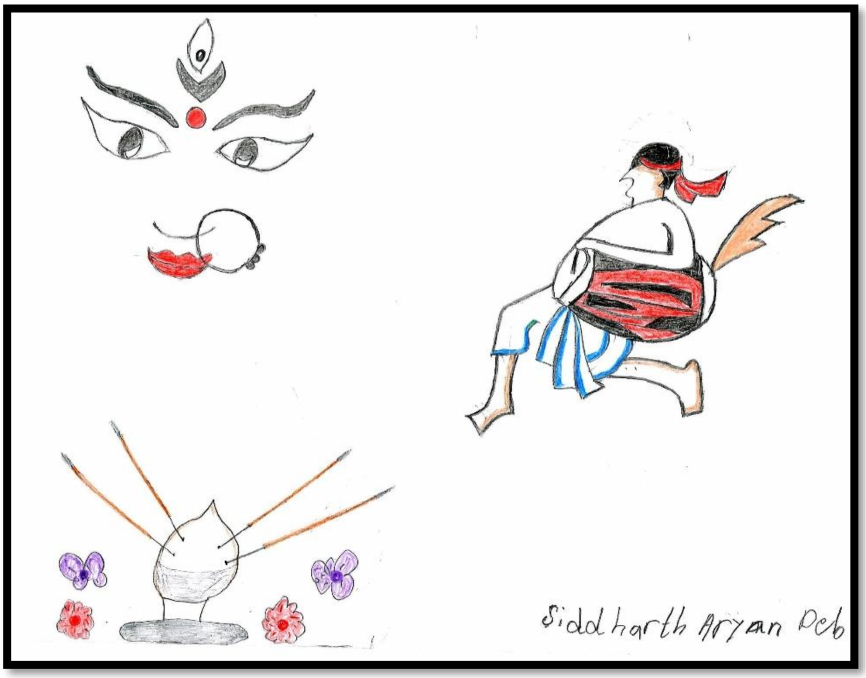

নোংরা নোট

অর্ঘ্য দাস

খুব নোংরা, কালিঝুলি লাগানো পুরোনো নোট (টাকা) হাতে পেলে অবাক হয়ে মাঝেমাঝে আমি তার দিকে চেয়ে থাকি | ভাবি এই কালো দাগ কি মেহনতি হাতের পরিশ্রমের চিহ্ন, নাকি অসৎ কারবারীর মনের কালিমা ! নাকি এই কালো দাগ শুধুমাত্র সময়ের পদচিহ্ন ?

বহুদিন ধরে কত পথ ঘুরে এই টাকা আমার কাছে এসেছে | কত সুখ-দুঃখের ইতিহাস রয়েছে এই বিশেষ নোটটিকে ঘিরে, কিন্তু সেই সব কাহিনী উদ্ধারের কোনো উপায় আমার জানা নেই | কেউ হয়তো এই টাকায় প্রেমিকার জন্য কোনো উপহার কিনেছে, কেউ হয়তো নিজের কোনো সাফল্যের আনন্দ বন্ধুদের সাথে উদযাপন করেছে, কেউ হয়ত নিজের পাওয়া প্রথম বেতন থেকে টাকা তুলে এই নোট হাতে পেয়েছে – মুখে ফুটেছে তার হাজার ওয়াটের বাতি, আবার কেউ হয়তো প্রিয়জনকে শ্মশানে দাহ করে তার দাম মিটিয়েছে এই নোট দিয়ে | কোনো ধনী ব্যক্তি হয়তো নিতান্ত অবহেলাভরে কোনো হোটেলের চাপরাশিকে এই টাকা বখশিস দিয়েছে, আবার কোনো দিন-আনি-দিন-খাই মানুষ হয়তো দিনের শেষে এই টাকা দিয়ে পরিবারের জন্য খাবার কিনেছে | কত ভালবাসা, কত আনন্দ, কত দায়িত্ব, কত অবহেলা, কত উচ্ছ্বাস, কত ব্যথা, কত দীর্ঘশ্বাস জুড়ে আছে এই বিশেষ নোটটার সাথে | একমাত্র সময়ই তার সাক্ষী !

কেউ কেউ আবার সময়ের বুকে নিজের ছাপ রাখতে নোটে নিজের নাম লিখে রাখে – কবে কোথায় তার সময় শেষ হয়ে যাবে ঠিক নেই, কিন্তু তার হস্তাক্ষর ঘুরতে থাকবে স্থান থেকে স্থানান্তরে, সময় থেকে সময়ান্তরে |

শুধুই কি কাগজী-মুদ্রা ? নাকি মানুষ, অনুভূতি আর সময়ের কোলাজ ?

@ টুকটাক লেখালেখি

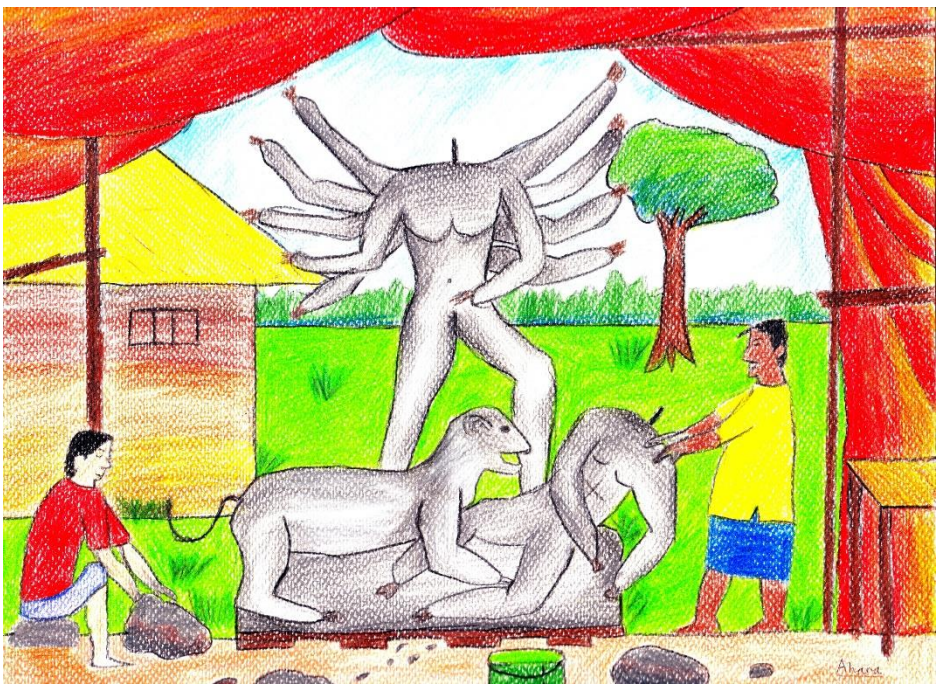

Ahana Dasgupta

পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য মানব শরীর হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিপ্লব পাল

এই পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই এককোষী জীব হতে লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা আজকের মানবে উত্তীর্ণ হয়েছি। মানুষের বিবর্তনের ধারা আজও অব্যাহত আর তা ঘটে চলেছে মানবের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এর মধ্যে দিয়ে। মানবের এই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এর ফল হলো আধুনিককালের প্রযুক্তিগত উন্নতি। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে আজ বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের বিবর্তনের শুরুটা হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে খুবই সাধারণ সূত্রের উপর ভিত্তি করে। গত শতাব্দীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বেশিরভাগই ছিল মেকানিক্যাল মুভমেন্ট নির্ভর, আর তার ফলে এদের আকারও অনেক বড় হত। আর আকার অনেক বড় হওয়াতে এদের বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা ছিল অনেক বেশি। যেমন প্রথম যুগের রেডিও রিসিভার এত বড় হত যে সহজে বহন করা যেত না। বর্তমানে তা এতই ছোট যে পকেটে বহন করা যায়। এরূপ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অপরিবহনযোগ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে পরিবহনযোগ্য (Portable) প্রযুক্তিতে।

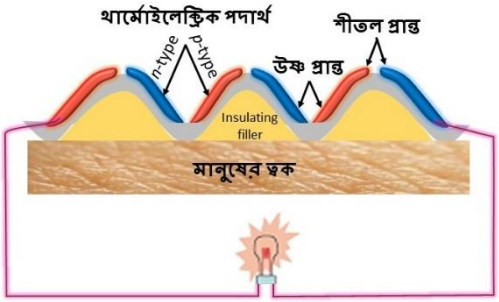

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হতে এই বিবর্তন এক অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির রূপ নিয়েছে, আর তার ফলে পরিবহনযোগ্য যন্ত্রাদির কলেবর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রূপ নিয়েছে, আর তার সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের শক্তির চাহিদাও ক্রমাগত কমেছে। পরিবহনযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির বেশিরভাগই এখন ব্যাটারি নির্ভর, কারণ ব্যাটারির উল্লেখযোগ্য কোনো সহজলভ্য বিকল্প আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজ আমরা যুগের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি যেখান হতে অদূর ভবিষ্যতে প্রযুক্তির বিবর্তন অন্যমাত্রা পেতে চলেছে। আমরা ক্রমাগত পরিবহনযোগ্য প্রযুক্তি হতে পরিধানযোগ্য (Wearable) প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করতে চলেছি। সম্প্রতি এই পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি হয়েছে বিভিন্ন অত্যাধুনিক ব্যবহারে, যেমন স্মার্ট টেক্সটাইল, হেলথকেয়ার নেভিগেশন সিস্টেম, অ্যাক্টিভিটি ট্রাকিং সিস্টেম, ইত্যাদিতে। বর্তমানে অনেক ইলেকট্রনিক মাইক্রোসিস্টেমের আকার এতই ছোট যে এদের শক্তির চাহিদা খুবই কম, মিলিওয়াট এমনকি মাইক্রোওয়াটের
পরিধির মধ্যে। আর তার ফলে শক্তি সরবরাহকারী ব্যাটারির আকার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে।

ইতিমধ্যে কিছু পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রে হয়ে থাকে রোগীর বিভিন্ন শারীরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য, যেমন হার্ট রেট (ECG ও HRV), ব্রেনওয়েভ (EEG), মাসল বায়ো-সিগন্যাল (EMG), ব্লাড প্রেসার, ইত্যাদি। এই পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির প্রধান অন্তরায় হলো এদের শক্তি সরবরাহকারী পাওয়ার ডিভাইসের সীমাবদ্ধতা। বর্তমানে সমস্ত ধরনের পরিবহনযোগ্য ও পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি মূলত ব্যাটারি নির্ভর, আর ব্যাটারির মূল সমস্যা হলো এদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর চার্জের প্রয়োজন হয়। এছাড়া ব্যাটারির পরিবেশগত প্রভাব যথেষ্ট ক্ষতিকর। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়বস্তু হল পুনর্নবীকরণ বিকল্প শক্তির উদ্ভাবন করা। পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য শক্তির উৎস হতে পারে আমাদের শরীর থেকে উত্পন্ন তাপ। আমাদের শরীর কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট হতে মেটাবলিজমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তাপ উৎপন্ন করে চলেছে। মানব দেহে উৎপন্ন মোট তাপশক্তির পরিমাণ আনুমানিক ১০০ ওয়াট। এই তাপশক্তির কিছুটা অংশ বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলেই পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির শক্তি-সমস্যার সমাধান হতে পারে। শরীরের তাপ হতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হতে পারে থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজি। সুইডেনের লিংশপিং ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বর্তমান গবেষণা ঠিক এই পরিধানযোগ্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির উপর। আমাদের নিরন্তর গবেষণার ফলে এক নমনীয় থার্মোইলেকট্রিক সিরামিক পদার্থের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।আমাদের এই উদ্ভাবন সম্প্রতি ইউরোপিয়ান থার্মোইলেকট্রিক সোসাইটি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে।
থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস যে কোনো উত্তপ্ত পৃষ্ঠতল থেকে শক্তি উত্পাদন করতে পারে। আর এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই নিরবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘকাল কর্মক্ষম। এর বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি কোন মেকানিক্যাল মুভমেন্টের উপর নির্ভরশীল নয় আর এই কারণে এর কর্মকান্ড শব্দহীন। শক্তি উৎপাদনের

জন্য থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসের এক প্রান্ত উত্তপ্ত পৃষ্ঠতলের সাথে সংযুক্ত করে রাখতে হয়, আর এর ফলে ডিভাইসের আড়াআড়িভাবে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি হয়। এই তাপমাত্রার পার্থক্যের ফলে থার্মোইলেকট্রিক পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহন শুরু হয়, যা পদার্থের মধ্যে তড়িৎ বাহকের সঞ্চালন শুরু করে। আর এর ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন শুরু হয়। থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির সবচেয়ে সফল প্রয়োগ এখনো পর্যন্ত হয়েছে মহাকাশ গবেষণায়, যেখানে রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া দীর্ঘকাল নিরবিচ্ছিন্ন শক্তির প্রয়োজন, বিশেষত যেখানে সৌরশক্তি সহজলভ্য নয়।

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) মহাকাশ গবেষণার জন্য এক বিশেষ ধরনের রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর তৈরি করেছে। এই জেনারেটরে একটি রেডিও একটিভ কোর থাকে যা তাপের উৎস হিসেবে কাজ করে। রেডিও একটিভ কোরকে ঘিরে অজস্র থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস সংযুক্ত করা থাকে। থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসগুলির আড়াআড়িভাবে প্রায় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি হয় যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে। রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটরের ব্যবহারের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ক্যাসিনি (Cassini) মহাকাশযান। ক্যাসিনি মহাকাশযান ১৯৯৭ সাল থেকে দীর্ঘ ২০ বছর শনিগ্রহের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত ছিল যা রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর দ্বারা পরিচালিত হত। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ২০১১ সালে নাসা দ্বারা প্রেরিত মঙ্গল যান কিউরিওসিটি (Curiosity)। এই মঙ্গলযান হলো মঙ্গলের পৃষ্ঠে চলনক্ষম একটি রোবট যা মঙ্গলের ভূপ্রকৃতির বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত এবং এখনো কর্মক্ষম। এই মঙ্গলযানও রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর দ্বারা পরিচালিত। এই সমস্ত ব্যবহারে মূলত ম্যাক্রো সাইজের থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির ম্যাক্রো হতে মাইক্রো ডাইমেনশনে বিবর্তন একান্ত আবশ্যক আর তার জন্য বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা করে চলেছেন।

পরিধানযোগ্য মাইক্রো-থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস আমাদের শরীর হতে মিলিওয়াট পাওয়ার উত্পাদন করতে সক্ষম যা বর্তমানে অনেক বৈদ্যুতিন ডিভাইসের চাহিদার জন্য যথেষ্ট। যেমন ECG এর জন্য ০.২ মিলি ওয়াট পাওয়ার যথেষ্ট। কিছু মার্কেট বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির বাজার ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। আর এই বৈপ্লবিক বিবর্তনের জন্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির বৈপ্লবিক বিকাশ প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা করে চলেছেন। তারা বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে চলেছেন। প্রথম ধাপ হলো এমন ধরনের পদার্থের উদ্ভাবন করা যার কর্মদক্ষতা বেশি হবে, অর্থাৎ কম তাপমাত্রা হতে বেশি পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন করতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের চ্যালেঞ্জ হলো উদ্ভাবিত পদার্থের মধ্যে নমনীয়তা নিয়ে আসা যাতে করে এরা পরিধানযোগ্য ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয় ধাপের চ্যালেঞ্জ হলো এমন কোন পদ্ধতির বিকাশ করা যাতে করে ল্যাব স্কেল হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে থার্মোইলেকট্রিক পদার্থের উৎপাদন করা সম্ভব হয়। আর সর্বশেষ ধাপ হলো থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসের ডিজাইন ও তার নির্মাণ করা। বর্তমান গবেষণা এমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে আগামী এক দশকের মধ্যে অনেক পরিধানযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে নিতে পারবে শরীরের তাপ থেকে, আর তা থার্মোইলেকট্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে।

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ২০১১ সালে নাসা দ্বারা প্রেরিত মঙ্গল যান কিউরিওসিটি (Curiosity)। এই মঙ্গলযান হলো মঙ্গলের পৃষ্ঠে চলনক্ষম একটি রোবট যা মঙ্গলের ভূপ্রকৃতির বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত এবং এখনো কর্মক্ষম। এই মঙ্গলযানও রেডিও আইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর দ্বারা পরিচালিত। এই সমস্ত ব্যবহারে মূলত ম্যাক্রো সাইজের থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির জন্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির ম্যাক্রো হতে মাইক্রো ডাইমেনশনে বিবর্তন একান্ত আবশ্যক আর তার জন্য বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা করে চলেছেন।

পরিধানযোগ্য মাইক্রো-থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইস আমাদের শরীর হতে মিলিওয়াট পাওয়ার উত্পাদন করতে সক্ষম যা বর্তমানে অনেক বৈদ্যুতিন ডিভাইসের চাহিদার জন্য যথেষ্ট। যেমন ECG এর জন্য ০.২ মিলি ওয়াট পাওয়ার যথেষ্ট। কিছু মার্কেট বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির বাজার ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। আর এই বৈপ্লবিক বিবর্তনের জন্য থার্মোইলেকট্রিক টেকনোলজির বৈপ্লবিক বিকাশ প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা করে চলেছেন। তারা বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে চলেছেন। প্রথম ধাপ হলো এমন ধরনের পদার্থের উদ্ভাবন করা যার কর্মদক্ষতা বেশি হবে, অর্থাৎ কম তাপমাত্রা হতে বেশি পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন করতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের চ্যালেঞ্জ হলো উদ্ভাবিত পদার্থের মধ্যে নমনীয়তা নিয়ে আসা যাতে করে এরা পরিধানযোগ্য ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয় ধাপের চ্যালেঞ্জ হলো এমন কোন পদ্ধতির বিকাশ করা যাতে করে ল্যাব স্কেল হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে থার্মোইলেকট্রিক পদার্থের উৎপাদন করা সম্ভব হয়। আর সর্বশেষ ধাপ হলো থার্মোইলেকট্রিক ডিভাইসের ডিজাইন ও তার নির্মাণ করা। বর্তমান গবেষণা এমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যে আগামী এক দশকের মধ্যে অনেক পরিধানযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে নিতে পারবে শরীরের তাপ থেকে, আর তা থার্মোইলেকট্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে।

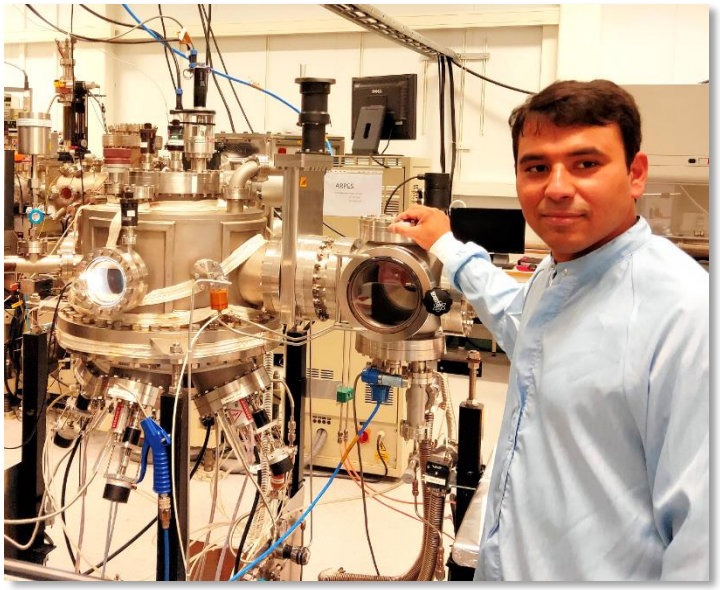

MOVIES FOR MY MOM

"Could you change the channel to Uttam Kumar movies please…" my Mom said to me in a matter-of-fact manner while she dipped the crunchy nut breakfast cereal into the bowl of warm milk. As I flipped from Netflix to YouTube with the Apple TV remote, it was clear to me that for my Mom, YouTube had become the equivalent of a channel devoted to Uttam Kumar.

Uttam Kumar was a legendary actor of Bengali Cinema who dominated the Bengali movie industry for more than 3 decades. Born in the year 1926, he died at a young age of 53 in the year 1980. He acted in more than 200 films including 15 Hindi films, and he still has a wide fan following across generations. He holds an iconic status in Indian cinema, with a metro station named after him including life size statues as well as commemorative stamps released to celebrate his birth anniversary.

My Mom would have watched at least a hundred of Uttam Kumar's films but she doesn't mind watching them again. The natural and effortless style of acting of this great actor impresses even the most discerning viewer. Uttam Kumar had more than 50 megahit movies to his credit and was hailed as a one-man industry but even he had a lot of critics during his time, as is natural for any successful person. Some people said he was fit only for commercial movies as a matinee idol, and he could not cater to the intellectual taste of certain segments.

This gap between commercial and intellectual had given rise to parallel cinema creating a new genre of art films. However the ultimate tribute was paid to Uttam Kumar by Satyajit Ray, one of the greatest art movie directors of all time, when he cast him to play himself in the movie "Nayak" (The Hero).

I asked my Mom to rate the Uttam Kumar movies along the two dimensions of "Story" and "Acting". Some movies had a good plot but the acting was not that great. On the other hand some movies had a lousy storyline but the acting was superb. Then there were some where both the story and the acting was great leading to the megahits.

My Mom diligently rated each movie along those two dimensions and her ratings led me to create an analytical view of Uttam Kumar's movies. I have actually plotted the ratings in a little 2x2 with Acting as the X-axis and Story as the Y-axis, leading to four quadrants. On the upper right quadrant are movies that are strong in Story as well as Acting. There are at least 50 films in that quadrant alone. On the bottom right quadrant are movies that are weak in Story but have strong Acting. Most of the remaining movies of Uttam Kumar fall in this quadrant!
Both the quadrants on the left side in my little 2x2 are fairly empty, with just a couple of entries. What does this mean?! Well it just goes to prove that there are not that many movies where Uttam Kumar

has not acted well. This is perhaps one of the reasons behind the unbeatable success of Uttam Kumar – there is hardly any movie where he did not do justice to his role!

In the beginning of his career, starting with "Drishtidan" in 1948, he had struggled a bit to establish himself. But after "Sharey Chuattor" in 1953 and "Agni Pariksha" in 1954, both turning out to be superhit movies - there was no looking back for him.

No matter who was his director, and who was his heroine, no matter how good the plot or how different the music, no matter how well the co-stars acted, Uttam Kumar was like a constant – he worked equally hard for every single role. A one-man industry indeed! For almost 30 years he maintained the same physique and the same charisma. Even at the height of his success, he continued to set new records. This level of discipline and diligence is rarely found. Uttam Kumar's wish was to die on the job in a studio - and that is exactly what happened. It was while shooting his last film ("Ogo Bodhu Shundori") that he suffered a massive stroke and was taken to hospital - never to return again in person, but securing a permanent place in the hearts and minds of millions of his fans - to this day.

- Debashish Chatterjee, *lives in South Jersey.*
http://www.dchatt.com/dchats-blog

Arunisha Singh

Festivals - Then and now

Parvati Sastri

India is the land of festivals and fairs. Some festivals welcome the seasons of the year or the harvest, some celebrate religious occasions and some festivals indicate the advent of the New Year or business year.

Ganesh Chaturdhi is an important festival that occurs during the rainy season. A house-hold event with Vinayaka worshipped in every house as well as a community event with pandals erected in street corners for the 11-day festival, with bhajans, cultural programmes and tasty prasad in the evenings. The festival brings back memories of our childhood with waking up early, happy trips to the market for the freshly mounted clay idol, flowers and the Eco-friendly puja material. Hectic activity around the house with fathers in charge of gathering the kids and conducting the Puja, while mothers were busy in the kitchen. Nothing can match the taste of homemade Undrallu/Modak with tangy ginger chutney. It was important festival during our school days, where we tried to overcome lack of preparation in studies with some serious prayers and fervent appeals to the Elephant God. The Vinayaka idol of our childhood was of clay, our preparations were humble and our prayers were simple. The festive fervour and worship of yesteryears is slowly giving way to pomp and show, huge pandals, blocking of roads, tall Ganesh idols , DJ-shows, and extravagant events.

Dussehra occuring during October-November time is a major festival that celebrates the victory of good over evil. The major events of the ten-day festival are the performances of the Ramlila n Northern India, A grand procession of goddess Chamundeshwari on a Golden throne in Mysore and Durga Pooja in West Bengal celebrating victory of Maa Durga over the demon king Mahishasura. During our school days, semester exams were held depending on the dates of Dasara festival. Once exams were finished and holidays declared, everything turned festive. Throwing away the books and free from studies, we used to play whole day coming home only to feast on special food items prepared as Prasad. Teachers were rewarded in cash and kind, school children were taken from house to house led by the teacher and singing in chorus,

“Ayya variki chalu aidu varahalu,
pillavandraku chalu pappubellalu…
Jayeebhava vijayeebhava digvijayeebhava…

The Telugu poem roughly translates as,

” Five coins are enough for the teacher…
sweets enough for the children....
Victory be yours!...
May you be victorious!…
Universal victory be yours !!

By the time we get over the festivities of Dasara, Deepavali used to be around the corner. This festival of lights is celebrated to mark Lord Rama's return to Ayodhya after conquering the demon king Ravana, symbolising the victory of Good over Evil, the triumph of Light over Darkness. My childhood memories of Deepavali were about festival holidays, early morning oil baths, new clothes, homemade

sweets, blessings from elders, greeting the neighbours, sharing the fire crackers with siblings, family puja sessions, lighting the earthen oil lamps and bursting the crackers. The friendly neighbourhood Deepavali of yesteryears is slowly transforming into Happy Diwali of Hallmark & Archies greetings.With Working couples, nuclear families and busy schedules, festivals are becoming low-key affairs.

Much water has flown under the bridge and the festivities from my childhood are going through many variations. With people migrating all over the Globe for education and career prospects, families getting together and celebrating are difficult propositions. No matter whether we celebrate at home or as a community event, festivals bring people together, instill a sense of belonging, take away the ennui of daily routine and nurture the feeling of well being. And efforts shall be made to celebrate, as festivals keep us connected to our communities, our culture and our roots.

Anupreeta Bhattacharya

Free Migration

'National tragedy': Trump begins border wall construction in Unesco reserve. Source: The Guardian Newspaper, Fri 13 Sep 2019.

Construction of a 30ft-high section of Donald Trump's border barrier has begun in the Organ Pipe Cactus national monument in southern Arizona, a federally protected wilderness area and Unesco-recognized international biosphere reserve. The Trump administration has deemed the new structures necessary due to a "national emergency" of unauthorized immigration into the US . I was going through world news and this article caught my eyes. In this era of Human Rights awareness and One World concept, a wall is being constructed in the US to prevent migration from its neighbouring country. History has seen the rise and fall of the **Berlin Wall.** Erected in the dead of night on August 13, 1961, the Berlin Wall (known as *Berliner Mauer* in German) was a physical division between West Berlin and East Germany. Its purpose was to keep disaffected East Germans from fleeing to the West.

When the Berlin Wall fell on November 9, 1989, its destruction was nearly as instantaneous as its creation. For 28 years, the Berlin Wall had been a symbol of the Cold War and the Iron Curtain between Soviet-led Communism and the democracies of the West. When it fell, the event was celebrated around the world. *I do not know who was the winner or loser in this chapter of world history?*

To begin with let us understand the definition of boundaries, which is a dividing line, a line which marks the limits of an area. Boundaries can be of several different types, Geographical, Political,Professional,Sociological,Psychological,Emotional,Mathematical, Gender, Religious and in Sports. Speaking of the relevance of a boundary in the sport of cricket , who can forget the 6 sixes by Yuvraj Singh against England in 2007..

Out of all the above mentioned types of boundaries, these two are most impactful.

1. **Politically caused geographical boundaries**
2. **Psychologically caused mental boundaries**

Politically caused geographical barriers are made to prevent people of a particular race, ethnicity, nationality from migrating into a geographically defined territory. The basic idea behind such laws are to feed the ego of the leaders. To mark oneself powerful over others. It is this kind of restrictions that lead to much bigger differences like political disturbances or war.

Moving onto **psychological boundaries** , it impacts our opinions, attitudes, status , consciousness, emotions which in turn deeply affects the ability to perceive the world. The way we treat each other, support or resent each other, communicate amongst people of different gender, religion, age, color everything is a result of our mindset.

But how do we develop a particular mindset? Well it is previously fed information from different sources like family, friends, culture, school, society, media and so on over the years.

When you smile at a baby, most probably it will smile back not thinking how you look like, or any other characteristics to decide it's response. It just knows the language of love and care. But the same baby after 4-5 years, has heard and observed enough to be influenced by its home environment to have developed a frail mindset. The toddler might still smile but not on first glance. The same child after 20 years might take awhile before smiling, because by then it has a very strong mindset of its own. That adult now has to mentally cross all barriers before letting the emotion to overpower into a smile.

My whole point is that psychological barriers are not a gift of nature but a creation by human mind.

Now that I mentioned nature, one day my daughter who spends most of her time questioning me about anything and everything she is curious about, asked one question.

She asked that mom, **when it rains, can the trees and plants choose the amount of rain falling on them?** Well that is a superb question and it planted a seed of thought in my mind.

Nature the biggest giver, most powerful entity has never differentiated in bestowing its resources to the living beings on earth. When nature is in the right balance with life then it is called heaven .

Just as the **Sun** has never reserved its rays from falling onto the surface but has reached out to the tiniest of corners it can creep into. Whether it is a place in the slums or a bungalow, a black guy or a white guy , when the sun is shining bright everyone under the blue sky has the right to enjoy it.
The **wind** never shies away from blowing all across.
The **Mother Earth** does not think before bearing fragrant flowers or juicy fruits, like who will consume it? Whether it is a honey bee or birds, insects, animals or humans. It just does it's selfless duty of nourishing all of us.
The **rain** or the **river** has never thought before quenching our thirst, the **sea** or the **ocean** has never asked for an identity before any voyage.

When nature has no boundaries, who are we to create them?
A brief look into the world of **free migration** .
I am glad that we have still not enforced our mindset on the nonhuman migrating species. These animals do not have any border security force positioned on the way of the migrating birds or schools of fish. Geese winging their way south in wrinkled V shaped flocks is perhaps the classic icture of migration. A sight to behold.
Migration is the large scale movement of birds between their breeding(summer) homes and their non breeding (winter)grounds.

Why do birds migrate?
Birds migrate to move from areas of low or decreasing resources to areas of high or increasing resources. The two primary resources being food and nesting locations.
Interesting fact: At least 4,000 species of birds migrate each year.
Many species of Salmon, Shad, Catfish, Sturgeons, Hilsa, Eel migrate between the sea and the river to complete their life cycle. Other species must make extensive migrations within their home rivers to reach critical habitats. Free migration routes for fish are crucial to their survival. If they cannot reach their breeding grounds, the species will decline and eventually become extinct. Around the world, millions of people rely on freshwater migratory fish as a primary food source and for their livelihood.
Interesting fact: World Fish Migration Day Celebrated on 16th May every year. I would like to mention that the marking of territory is not uncommon amongst animals. By **marking their territory** they signal to other **animals** of the same **species** that, that area and the food resources contained within are being used. Another reason is for purposes of mating. Some animals like dogs, tiger spray urine or rub themselves on trees and bushes to mark their zone. To sum it up, nature has no boundaries but the living species with increasing complexity of minds have decided to mark their space in their **own unique ways to feed their greed and not need.**

I am wondering how would the world look like if we take away all the boundaries and enforce free migration to one and all?

~ Reshmi Ghosh.
Teacher by profession and cultural enthusiast by passion

I rarely write poems anymore

Siddharth Saurabh Sahu

It pains me,
That I rarely write poems anymore.
That I rarely get to pour out my mind,
While the rest of the world I ignore.

I guess,
A poet needs to be a tortured genius,
Or be somewhat indifferent to the world.
But what do I know about poetry?
I rarely write poems anymore.

Getting busy,
With grocery shopping on weekends,
Planning my dinner on the way home,
How can I arrange my thoughts into words?
While deadlines soak my creativity to the bone!

And when I do get,
An occasional solitary emptiness,
Social media fills my mental void,
Keeping me away from poetic readiness.

Hence today,
I have this terrible thing to confess,
Although I'm happily married to science;
I sometimes miss poetry - my mistress.

So I am compelled,
After this occasional late night adultery,
To quietly return back to equations,
Having cheated on science with poetry.

And it definitely pains me,
That I rarely write poems anymore.

সময়

দেবাঞ্জন দত্ত

মাঝে মাঝে খারাপ সময় আসে,
আর আমি তখন চিনে নিই কিছু ভুল।
ভয়ের সময় আসে,
আমি গুনি - আমার হাত ধরে আছে কার বিশ্বাসী আঙ্গুল।
হতাশার সময় আসে, দুঃখের সময় আসে, একার সময় আসে
চায়ের কাপে ঝড় তোলা গল্প যায়,
চোখ ঝাপসা লাগে, তবুও চোখ খুঁজতে থাকে
তখন আমি বুঝতে থাকি - কেন একলাটি আমার পায়।
না পাওয়ার সময় আসে, হারানোর সময় আসে,
আসে বেদনার রোদে করে দীর্ঘ ছায়াশোক,
আমি তখন চেয়ে দেখি - প্রিয় মুখ থেকে ক'খানা আছে
ক'খানা হল পরমুখ !
কান্নার সময় আসে, অসুখের সময় আসে
আসে অবুঝের মত বিদেশি কিছু হাওয়া,
আসে অসুরের কালবেলা, আসে দানবের হুংকার ,
আমি দেখি কে - থেকেছে পাশে আর কার চলে যাওয়া।
মন্দ সময় আসে, আসে অন্ধ সময়, তখন চিনে নিতে হয় ভুল,
খারাপ সময় মানে আপন চিনে নেবার প্রাকৃতিক ইশকুল।

Rachael Das

Ilish Paturi in Sverige

Sourjya Chowdhury

Novels have been written, poems have been composed and even movies made about it. My father is, what we Bengalis call, a **poka** and I have found solace in it, when everything else seemed dull. Yes, I am talking about the *Ilish Paturi*.

When I stepped into Sweden three years ago, I knew I was leaving behind two most integral parts which defines a Bengali- a) the Durga Pujo and b) the Bengal fish- especially the *paturi*. While I found home in SSPC during Durga Pujo far away from home, on the other hand, I never really managed to get hold of *Ilish Paturi* anywhere in Sweden. It was in April earlier this year, when me and my Bengali friends in Stockholm, finally decided to cook *Ilish Paturi* from scratch. *Yes, cook. Yes, from the scratch.* You see, the *paturi* is a piece of heaven wrapped in a banana leaf- juicy, tangy and with just the right amount of energy that makes your Sunday lunch worthwhile. A delicacy belonging to the classic Bengali hall of fame- there aren't many other dishes that represents the standards of *Bangaliana* quite like the *paturi.*

Coming back to our brave decision about making the *Ilish Paturi*- we figured out what all we needed for the dish and the two most important parts were eventually the hardest to get- **one, the fish itself** and **second, the banana leaf**. After a thorough investigation, we found the place where we would get the Hilsa fish, *albeit frozen*. The *Himalayan Indian store* near KTH Royal Institute of Technology, was our go to place for it but what is a **paturi without the banana leaf**?

We searched on the Internet, asked various people but nobody knew where we could get banana leaves. The only solution we got was asking one of the Indian stores to have it delivered for us but we would've needed to wait for three weeks- **a strict no** since we didn't want to wait that long. The day before our cooking experimentation, we even pondered about the possibility of cooking it and then packing it in a piece of paper- to get as close to the *paturi feel* as possible. However, we quickly brushed aside that idea and I thought about trying my luck in an Asian store, one last time.

So when the Sunday finally arrived, I left early morning for this Asian store in Hötorget. No promises, no expectations- just one hope of finding banana leaves to cook *Ilish Paturi.* Yes, just a tiny hope- that's the extent a *Bangaali* can go to have their fish. I knew a large part of the Thai cuisine are served in banana leaves and since Stockholm have such a huge craving about Thai cuisine in general, there was no harm in trying my luck. I reached the *Oriental Supermarket* at 10am in the morning, and my joy knew no bounds when I found out they sell banana leaves. **500g of Banana leaves for 45 SEK**. Not the best deal compared to Indian standards, but I was already in heaven and I wasn't letting myself slip out of it. I got the Banana leaves and headed home as a very happy person.

What followed was Hilsa fish covered in mustard paste, slit green chilies, a dash of salt and *haldi,* wrapped beautifully in banana leaves, served hot and tender on our plates with rice, *dal* and *aloo bhaja*. A Sunday lunch in Stockholm that I will never forget.

The recipe that I used was from BongEats (https://www.bongeats.com/recipe/ilish-paturi) and its as follows:

INGREDIENTS :

- 280 g (or 4 pcs) ilish machh (hilsa fish, 3-cm-thick pieces)
- 40 g mustard seeds (soaked overnight)
- 8 pcs green chillies
- 40 g coconut (peeled)
- 50 g yoghurt (beaten)
- 24 g salt
- 2 g sugar
- 2 g turmeric powder
- 20 g mustard oil

METHOD :

1. Soak mustard seeds overnight in water.
2. Clean the *ilish machh* and cut it in 3-cm thick slices. *Kolapaturi* is best made with thick slices of fish. Set these pieces aside, preferably on a flat plate.
3. Drain the mustard seeds of the water they've been soaking in and add them to a grinder jar. Add 4 green chillies, roughly chopped, along with 100g water. Grinding green chillies with the mustard ensures that it doesn't turn bitter.
4. Grind these to a fine paste. Take your time with this process. Scrape down the sides of the jar and grind as many times as it takes to form the smoothest possible paste. The finer the grind, the better the flavours.
5. Now, add the peeled and chopped coconut to the grinder jar, along with salt, sugar, and turmeric powder. Grind once again till everything is smooth and well combined.
6. Transfer this paste to a mixing bowl. Add the beaten yoghurt and mustard oil. Mix till the oil is fully incorporated.
7. Spoon this mixture over the *ilish machh*, dividing it equally. Turn the fish over and coat the other side as well. Use your hands to make sure every part of the fish, including its cavities, are well coated. Set it aside to marinate for 15 minutes.
8. Meanwhile, wash and cut up some *kolapata* into rectangular sheets, 20 cm by 50 cm in dimension. Gently toast them on a pan set on medium heat. This will increase malleability of the banana leaves, ensuring that they don't crack when folded. Remove from heat and set aside.
9. Take a banana-leaf sheet in front of you. Spoon some mustard paste in the centre of one of the sheet. Set one piece of the fish on it. Top off with some more of the paste and a split green chilli.
10. Carefully wrap the fish with the banana leaf making sure that it is fully covered. If you find that your leaf is torn, wrap another layer of leaf around it. Tie this parcel up securely with a cotton string (don't use synthetic or it will melt when heated).
11. Add a tablespoon of oil to the *tawa* (pan). Once hot, place the parcels on it side by side.
12. Cover and steam the banana-leaf parcels on low heat for 5 minutes on each side.
13. Unwrap and serve hot.

So if you thought having *Ilish Paturi* in authentic Bengali style was a distant dream, I hope I made it somewhat easier by sharing my story.

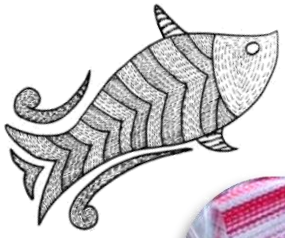

A Bird-story

Suvradeep Mitra

I work in a renowned private farm. I draw a huge salary every month and tend to indulge on my profligacy by buying perfumes, and traveling to remote places. I find travels de-stressing and job distressing despite the fact that the latter earns me my bread where the former expends it.

I am married with a kid who is now promoted to a primary school. My wife is a working woman with an ostensibly busy schedule and an ostentatious boss. She needs to work hard to get promotions which do not come easily and annually like our son's school. She does not like the quiet and quaint I search while traveling, and prefers to stay at home. Moreover, our son is now growing, and one of us has to stay back to take care of him. Hence, I am used to travel alone these days.

We are expecting a new member in our family by the latter part of this year. This has restricted Priya's movements further or her intent to move out. She sometimes only instigates me for dining together from nearby outlets and that's it. We have grown sedentary as a family.

Priya, my wife is not satisfied with her job. She feels that she gets only a pittance for the work she does. The job is demanding and she does not want to bring work home. Hence, she needs to stay back at the office and finish her daily assignments.

Her face has started taking the brunt of her daily chores to show premature wrinkles and a gauntness unprecedented to my eyes.

Each day I have started losing the girl I enticed once in a family gathering.

* * * * * * * * * * * * *

We were having dinner together. It was an evening of mid-April and the fans had already started running at full limbo in this part of the country. The humidity had also soared up. We came back home after a tiring day and we had nothing to discuss in the dinner. Our son had already slept and Priya had taken care to tell her a bedtime story.

Our silent chewing of food was riddled with an uncanny distance between the two souls staying under the same roof.

"Can we go for a short trip in the weekend?" I asked, breaking the silence.

"Why are you asking me? You know that I cannot come." She kicked back. What ensued was an unfruitful discussion with me trying to pursue her followed by her devout denial.

Hence, I decided to go alone to North Bengal.

* * * * * * * * * * * * *

I took the early morning flight and reached Bagdogra airport in the morning. Priya packed me my breakfast in a small tiffin-box. I called her up to let her know that my flight landed safely. The cab driver was waiting for me outside the terminus at the usual meeting place as I visit this place at least once a year.

The sky had a creamy hue and the chill had not yet left the roads. It was stuck to the lush verdant tea-garden as dew-drops. It lingered to the rusty roadside pillars in the form of cold crusts and water-wisps. It impinged onto the vast meadow as mist and it beguiled the eyes of the plebeians as sleep. The blue mountains stood one after another with gradually fading silhouette, like a sound that fades into an echo. The river rumbled as the butterflies unfurled their moist wings to dry under the new sun. The water had turned frothy grey from the serene turquoise as the glaciers started melting.

We parked the car by the side of the river and stood for a while. A roadside shop welcomed me as I bought a cup of tea. As I nibbled on my breakfast, I tasted love and care. The love emanated from a once-jubilant charming girl who loved to wear yellow and the care exuded from the same girl who turned a middle-aged wife and a mother of one who was struggling her way through desire, dilapidation, and dust.

I remembered the days when we came here for the first time. We used to enjoy the tranquility and the sound of the flowing river. Her coiffure used to be a neat braid in those days unlike the unkempt bun she wears now. I maintained the habit of coming back to this place but she somehow could not make her way through and adjusted with the urban cacophony.

We drove for almost four hours to reach our destination. It was an idyllic hamlet at the base of the Himalayas with only a single lodge for stay. The accommodation comprised of a room with damp wall and a small washroom. There was a common dining space for all the lodgers which never exceeded ten. The paint of this room was wearing off as it was probably never re-painted since the time I first visited this place with my dad.

* * * * * * * * * * * * *

My dad was a common man. He worked very hard in his first life to have a square meal and then established a family of his own with a paltry income. He never traveled in an air-conditioned train compartment till I grew up. The possibility of flying in an aeroplane was farfetched. It was me who booked his first air-ticket with my earnings.

It was with my dad that I learnt to appreciate the forlorn beauty of the Himalayas.

My dad believed in the chores and regularity. He maintained his habit of early rising throughout his lifetime. He used to visit our ancestral house in every weekend. When my mother started losing her ability of deciphering time, place and person, my dad used to bring her tiffin. Everyday at the same time. Without a fail. Despite rain, storm, heat or traffic, all synonymous and equivalent to calamity. One day, he packed her food and went to the hospital and waited there for hours before knowing that a white veil had been drawn over her eyes. That was the last time I saw tears in his eyes.

I used to walk down the valleys with my dad. He liked the aroma of the cedar and used to talk about life on our way. Principled and disciplined, he never lost the child inside him which laughed and enjoyed during our travels that used to be short and cheap yet full of life. I am still in search of the same life while traveling.

His pocket used to have only a few pennies yet his heart jingled every time he booked three sleeper-class berths for us on a holiday. The child grew younger each year as he added a new layer of grey hair. One day when the child could not grow further younger, it simply ceased to exist in its mundane form. I believed that he probably had gone back to the womb of the mother earth as the world could not hold him anymore and let him progress further in his retrograde progression of mental age.

Yet the valleys stood unaffected and untouched. It stood silent and somber as if nothing has happened. As if an addition of a star in the sky meant nothing to them.

I could not return to this place for years thereafter.

* * * * * * * * * * * * *

It was already lunch-time and a grey cloud loomed over us. A downpour soon started as I waited for it to stop with all alacrity. It indeed stopped but the night had already fallen by then. Nowhere to go, I watched a pair of barn swallow that had nested over the dining-bulb and had given birth to seven ever-shouting and ever-demanding mouths. The little swallows stayed inside their mud-nest, eyes shut fast, moving only in response to the movements of their parents' who fed them sequentially and

continually. The kids did not develop any feather and was furry grey in contrast to their parents, who had glowing royal blue wings and chestnut colored bellies.

* * * * * * * * * * * * *

I stood first in my college-exam. It was an important exam and I worked really hard that time. So, I demanded a walk-man. A walk-man used to be a gadget of the era when we used to click photos in a 36-reel camera with negatives inserted into it. Owning a walk-man was my dream and I always imagined listening to songs while going to college to heighten my style statement among the peers, especially those that belonged to the opposite sex. I used to like a pretty girl in our class.

My dad asked "How much does it cost? Your walk-man?" and then he mumbled "it's way too costly. We already have a tape-recorder and this thing is nothing but a portable tape-recorder".

I was furious.

Who can argue with a person who does not know the difference between a tape-recorder and a walk-man?

"A tape-recorder is a tape-recorder, big, black and uncool. It's nothing compared to a walk-man. Moreover, a walk-man has ear-phones. How cool is that? You do not disturb anyone and listen to the songs." I said.

The furrows around my dad's eyes deepened and he said "But we can't listen to the songs you're listening".

I was simply disgusted.

* * * * * * * * * * * * *

It was a new morning and the glum of the previous afternoon was nowhere to be seen. The breakfast and lunch were simple and tasty. The mobile signal was weak and I could not contact Priya. It did not bother me much as she was aware of the weak network.

The innkeeper's son came to meet me during lunch.

"Sir, are you carrying your camera this time?"

"Yes. Indeed." I answered.

"Finish your lunch sir and I will take you to a nearby place. You can see something which you probably have never witnessed in your lifetime."

"The place is a little bushy and inside the forest and you may have to wait for a long time without making noise. But I can assure that your wait will be worth."

"Forest? I hope there is no danger." My skeptical urban sense suddenly crept back in me.

"No sir." He replied.

"Ok then." I said.

Bimal, the innkeeper's son guided me through the bushy undergrowth to a place inside the forest. The forest floor was moist and the air was full of the aroma of fallen foliage. He asked me to stand hidden behind a tall pine tree and pointed towards another tree.

"Sir, watch that tree closely. Can you see a hole in it? That's the nest of a bird."

"So?" I felt sudden irritation towards Bimal. "You brought me here to show me a bird's nest?"

"Wait Sir. The female is inside the hole. The male will come to feed her." Bimal pleaded.

"Why?" I quizzed.

"The female is pregnant sir. It is expecting to lay eggs."

My irritation had subsided a little. That's a wonderful gesture, I thought.

"But Bimal, why is this so special?"

"Trust me Sir and wait. Please. I will come back in a while. Just keep watch. Else you will miss it." Bimal reminded me and left me there.

I waited for more than an hour and gradually started growing impatient.

It was then when I saw it. The bird, a rufous-necked hornbill, a vulnerable species, swooped in the frame. Its wingspan was as big as a five-feet tall man and yet it came without warning, like a gust of wind. It brought a whooshing sound with its flight, like a sail of a ship and ensconced over a straight horizontal branch above the nest. It was gigantic in size with a huge yellowish beak with parallel dark ridges over it. Its head and neck were rufous with jet black body. There was a scarlet pouch-like area at the junction of its head and neck. Its eyes were bordered sky-blue like the blue mascara. It poised itself by the help of its long tail that was jet black in color with creamy white tip.

Once settled over a nearby tree, the branch of which stooped down in its weight, it started picking and eating its greenish black fruits one by one to empty the whole branch gradually. I noticed a sudden stir inside the tree-nest. The tips of the beak of the female hornbill just peeped outside the nest which looked lifeless and empty a couple of minutes back. The male hopped back to the tree with the nest, positioned it vertically and started regurgitating the fruits it swallowed. Patiently and carefully it transferred all the half-chewed fruits to the eagerly waiting beaks of its female counterpart. The whole ritual lasted a few minutes and then came another whooshing sound before the male disappeared into the canopy.

I was so engrossed in the moments that it hurt me to come back to the reality.

My trance was broken after a few seconds by a human touch over my shoulder. I saw a beautiful lady smiling at me. Before I realized, I found myself clasped in a tight embrace.

The lady, who charmed me once and for a lifetime whispered me in my ears “Remember the first time we came here?”

* * * * * * * * * * * * *

Priya later revealed that she made a secret plan of coming to North Bengal one day after my arrival. She booked her tickets and took the risk of traveling this far after consulting her doctor. Then she arranged with her parents to take care of our son, Prithwish. She already knew my destination and stay.

That night we sat together in silence gazing the stars like before.

The silence was riddled with an uncanny warmth.

She drew my hand and placed it over her belly.

Someone kicked from inside.

* * * * * * * * * * * * *

Fifteen years back, I came back from my college, still furious with dad.

“How was your day?” My mom asked me. “Usual”, I chirped nonchalantly.

And then she handed me over the walk-man I desired for and she was beaming. “Your dad bought you this.”

“But this is expensive, mom.” I exclaimed.

“He said that a dad should always love, care, and protect his family.” Mom replied and went to cook my favorite dish that night.

* * * * * * * * * * * * *

The walk-man lost its importance in time and got replaced by compact discs. The discs also transitioned into digital songs freely available in internet.
I do not use earphones these days.
We sing together as a family whenever we feel like.

ছোট্ট পাখি

সমরেন্দ্র কুমার দত্ত

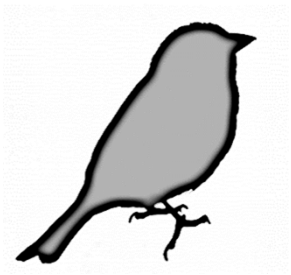

ভোরের বেলায়, ছোট্ট পাখিটা, গাছের ডালেতে বোসে,
কিচির-মিচির ডাকাডাকি করে সকালের পরিবেশে।
প্রকৃতির নীল আকাশের নিচে ডানা মেলে উড়ে যায়,
গাছ থেকে গাছে নাচানাচি করে, সুখ টুকু পেতে চায়।
ডাল থেকে ডালে, পাতার ফাঁকেতে, খাবারের খোঁজ করে,
কিছু না কিছু সে ঠিকই পেয়ে যায়, পেট টুকু তার ভরে।
সাথীর সাথেতে গাছে গাছে ঘুরে, খেলা কোরে দিন কাটে,
সকাল, দুপুর, বিকেল গড়িয়ে আঁধারের রূপ ফোটে।
খড়-কুটো দিয়ে তৈরি বাসায় বিশ্রাম নেয় রাতে,
সারাটা দিনের ক্লান্তির ঘুম নেমে আসে আঁখিপাতে।
নিজে ও সাথি-তে রাত্রি কাটায় তাদের ছোট্ট বাসায়,
পাশাপাশি থেকে, শান্ত চিত্তে সঙ্গসুখের মায়ায়।
সকালবেলায়, ভোরের আলোয়, আপন-মনেতে ডাকে,
আবার খেলায় মেতে ওঠে তারা সবুজ পাতার ফাঁকে।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

সুজয় চ্যাটার্জী

প্রবন্ধ লেখা ও ভ্রমণকাহিনী বিবরণ করায় আমার অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার যথেষ্ট অভাব আছে। তথাপি সঙ্কোচ বোধ নিয়েও বিগত ২০১৮-২০১৯ সালের আমার গবেষণার স্বার্থে বিদেশে থাকার এবং সেই সংলগ্ন টুকরো টুকরো স্মৃতি পাঠকদের কাছে নিবেদন করার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস রাখলাম।

শৈশব থেকেই স্বপ্ন দেখতে মানুষ খুব ভালোবাসে। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। আবার স্বপ্ন দেখা ও তার বাস্তব রূপায়ণ অনেকাংশেই অসম্ভব হয়ে আমাদের পীড়া দেয়। সেই রকমই আমার মনের একটা সুপ্ত বাসনা ছিল বিদেশ ভ্রমণ ও তার সাথে অজানাকে জানা। কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে ভারতে গবেষণা (পিএইচডি) শেষ করার সাথে সাথে সেই স্বপ্ন পূরণ হবার সুযোগ এলো ফ্রান্সের এক ইউনিভার্সিটি যাবার সুযোগে। আমি ওখানে পোস্ট ডক্টরেট হিসাবে গবেষণা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। নতুন এক অজানা দেশে দীর্ঘ এক বছর থাকার সুযোগ পেয়ে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তবে দেশ ছেড়ে বিদেশে এই এক বছর থাকার পরিকল্পনায় তে কিছু মানুষের অকৃপণ সাহায্য আমাকে অনেক কঠিন বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।

ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে ফ্রান্সে থাকার ছাড়পত্র নিয়ে আগস্টের ২০১৮ তে পাড়ি দিলাম সেই বহু প্রতীক্ষিত দেশে। আমার ইউনিভার্সিটি ছিল ফ্রান্সের এক সুন্দর শহর নিস-এ। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দুবাই হয়ে দীর্ঘ যাত্রা শেষে ওখানকার বিমানবন্দরে নামলাম। ইমিগ্রেশন প্রসেস সম্পন্ন করে বাইরে পা ফেলতে সে এক সম্পূর্ণ অচেনা স্বপ্ননগরী আমার সামনে। মনোরম আবহাওয়া, অপরূপ নীল সমুদ্র, এবং অভূতপূর্ব আল্‌প্‌স পর্বত - যেন এক অতুলনীয় মেলবন্ধন হয়ে ধরা দিল আমার সামনে। নিস শহরের সেই অপরূপ সুন্দর সমুদ্র সৈকত এবং মেডিটেরিনিয়ান সমুদ্রের খুব সন্নিকটে আমার অ্যাপার্টমেন্ট। ধীরে ধীরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শহরটির প্রতি এক অদ্‌ভুত ভালোলাগার জায়গা তৈরি হল। এই শহরটি খুবই সাজানো-গোছানো এবং পরিষ্কার। বিভিন্ন জায়গায় নানা নকশা করে ঘাস কাটা। খুবই আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করলাম যে সকালে রাস্তায় যানবাহনের অনেক চাপ থাকলেও সেইরকম হর্ন শোনা যায় না। যানজট ও খুব বেশি হয় না। বরং গাড়ির গতিবেগ অনেক বেশি মনে হল। আমি উপলব্ধি করছি যে ভারতে তথা কলকাতায় ট্রাফিক ব্যাবস্থা যদি ওই দেশের মতো হতো তবে অনেক মানুষের যানজটের নিত্য যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হতে পারতো। যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই সাশ্রয়ী এবংবাসযাত্রা যথেষ্ট আরামদায়ক। মাত্র ১,৫ ইউরোতে চুয়াত্তর মিনিট বাস অথবা ট্রামে যাতায়াত করার সুযোগ এবং সুব্যবস্থা আছে। তাই বেশিরভাগ ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে বাস কেই গ্রহণ করেন। বাস খুব উচ্চ গতিতে চললেও তার ঝাঁকুনি অনুভব করা দুষ্কর।

ফ্রান্সে পৌঁছে তাদের ভাষা রপ্ত করার ইচ্ছা থাকলেও সেটা ক্রমশ আর পরিপূর্ণতা পায় নি। ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ইংরেজি ভাষায় অভ্যস্ত বলে আমার প্রাথমিক দিনগুলিতে কোন সমস্যায় পড়তে হয় নি। তবে সেই সুখ খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দীর্ঘকালীন মেয়াদের ভিসার জন্য ফ্রান্সের এক অফিসে আমাকে সাক্ষাতের জন্য আবেদন করতে হয়েছিল। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ছাত্র ও গবেষকদের বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে সহায়তা করার জন্য একটি ওয়েলকাম সেন্টার আছে। সেই সেন্টারের একজন জার্মান অফিসার আমার মিটিংয়ের দিন উপস্থিত থাকবেন বলে ঠিক হয়েছিল। নির্দিষ্ট সাক্ষাতের দিন আমি ওই অফিসে পৌঁছে দেখি সেখানকার ফরাসি অফিসাররা ইংরেজি ভাষাতে অতোটা পারদর্শী নন। লাইনে দাঁড়ানো অসংখ্য মানুষকে বিভিন্ন গাইডলাইন তারা দিচ্ছেন। কিন্তু ইংরাজিতে কথা না হওয়ায় আমি খুব সমস্যার সম্মুখীন হলাম। সেই ফরাসি অফিসারদের বারবার অনুরোধ সত্বেও কথা হলো না। এতে আমার নমনীয়তার অভাব বোধ হলো। ইতিমধ্যে সেই ওয়েলকাম সেন্টারের জার্মান অফিসার এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি অসাধারণ দক্ষতায় আমার ও ফরাসি অফিসারদের সাথে এক অদ্‌ভুত সেতুবন্ধন স্থাপন করলেন। ফল স্বরূপ সেই যাত্রায় তাদের ভাষা অবগত না হওয়ার বিপদ হইতে উদ্ধার পেলাম। এরপর শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে গবেষণা। আমি দিনগুলিকে উপভোগ করছিলাম। আমার ফরাসি একাডেমিক সুপারভাইজার খুবই হেল্পফুল। তিনি যেকোনো

সমস্যায় বারংবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি এইভাবে দিনগুলো যেন আরো উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমরা একটি কনফারেন্সে গবেষণা পত্র পাঠ করার আমন্ত্রণ পেয়ে স্পেন ভ্রমণের একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম।

স্পেনের গ্রান ক্যানারিয়া দ্বীপের লা পালোমা শহরটি ছিল কনফারেন্সের মুখ্য স্থান। এই লা পালোমা শহরটি হল ক্যানারি আইল্যান্ডের রাজধানী। এটি একটি জনবহুল শহর। এই জায়গাটির অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধে অবগত হলাম সেখানকার কিছু বাসিন্দাদের কাছ থেকে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২সালে আমেরিকার উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রার সময় এই শহরে জাহাজ নোঙ্গর করেছিলেন। তাঁহার সমুদ্রযাত্রার এবং জাহাজের বিভিন্ন অসাধারণ স্মৃতি সংরক্ষিত আছে কোলন হাউস বলে একটি মিউজিয়ামে। সৌভাগ্যবশত কনফারেন্সের শেষে একদিনের অবকাশে এক বাঙ্গালী গবেষককে সঙ্গী করে শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এই শহরের আবহাওয়া এতটাই মনোরম যে কোন সময়ে গরম অনুভব হয় না। এই মনোরম আবহাওয়া আমাদের ভ্রমণের জন্য খুবই অনুকূল হয়ে উঠল। এখানকার নানা আর্কিটেকচার, ওল্ড টাউন, পরিদর্শনের পর দর্শন করলাম সেই পুরনো কোলন হাউস। অসাধারণ সব স্মৃতি নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়েছে এই বিরাট মিউজিয়ামে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান সান্তা দে ক্যাটালিনা ক্যাথিড্রাল চার্চ এ উপস্থিত হলাম। এই চার্চ এর লিফ্ট দিয়ে উপরে উঠলে পুরো লা পালোমা শহর প্যানোরামিক ভাবে দেখা যায়। সে এক অপরূপ দৃশ্য। নীল সমুদ্র, সারি সারি জাহাজ, বন্দর, পাহাড়, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বাড়ি সবই মিলে মিশে একাকার। অনেক দর্শনীয় স্থান ছড়িয়ে থাকলেও সময়ের অভাব এর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভ্রমণ করে আবার নিজ শহরের পথে রওনা দিলাম।

স্পেন থেকে নিস শহরে পৌছাবার জন্য সমস্ত বিমান গুলি প্যারিসকে অন্তর্বর্তী কালীন বিমানবন্দর হিসেবে ব্যবহার করে। তাই আমিও সেই স্বপ্নসুন্দরী, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহর দর্শন করার অভূতপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া করতে পারি নি। প্যারিসে ২ রাত্রি ভ্রমণে আইফেল টাওয়ার, লুভর মিউজিয়াম, ইত্যাদির মত প্রসিদ্ধ স্থান গুলি দর্শনের পরিকল্পনা করলাম। শৈশবেই পড়েছি ইউরোপীয় সভ্যতার একটি পীঠস্থান হলো প্যারিস। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও স্থাপত্য র নিদর্শন এই শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে প্রথম দর্শনেই উপস্থিত হলাম আয়রন লেডি কে পরিদর্শন করতে। আইরন লেডি আসলে আইফেল টাওয়ারের নাম। অনেকেই ওই নামে আইফেল টাওয়ার কে সম্বোধন করে। আইফেল টাওয়ার দর্শনের আস্বাদ অপূর্ণ থেকে যায় যদি তাকে দুটো বেলায় তথা বিকেলে এবং রাতে দেখা না হয়। তাই দুপুরের দিকে রওনা হলাম আইফেল টাওয়ার দেখতে। পরে বিকেলের দিকে আবার আইফেল টাওয়ারের উপর থেকে প্যারিস নগরী দেখতে গেলাম। আইফেল টাওয়ারের উপর থেকে প্যারিস নগরী দেখে আমার শাম্মী কাপুর এবং শর্মিলা ঠাকুর এর হিন্দি ছায়াছবি "ইভিনিং ইন প্যারিস" এর কথা মনে পড়ে গেল। এখানে ঝাঁ-চকচকে শহরের ফুটপাতে অসংখ্য ছোট ছোট কফি খাওয়ার জায়গা। পুরনো বাড়িগুলির জানলায় সুসজ্জিত টব এ থরে থরে ফুলের সমারোহ সবাইকেই মুগ্ধ করে। এখানে সিন নদীটিকে প্যারিসের হৃদয় তরঙ্গ বলে অনেকেই সম্মোধন করে। প্রত্যক্ষ করলাম অগুনতি প্রেমিক-প্রেমিকাকে ছোট ছোট নৌকায় সেই হৃদয় তরঙ্গের বুকে রোমান্টিক ভাবে আবদ্ধ হয়ে বিচরণ করতে। পরের দু'দিনে বাকি কিছু দর্শনীয় স্থান উপভোগ করলাম। শিল্প-সাহিত্যের মহানগরী প্যারিসকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে গেলে অন্তত এক সপ্তাহের অবকাশ নিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত। যদিও সেই বিলাসিতা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অনেক স্থান পরিদর্শন অসমাপ্ত রেখেই কিছু স্মৃতি আর ভবিষ্যতের ইচ্ছে সঙ্গী করে রওনা হলাম আমার শহর নিস এর উদ্দেশ্যে।

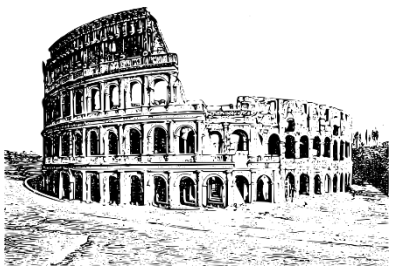
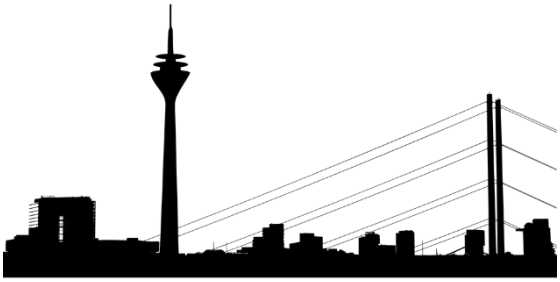

মাতৃবন্দনা

সীমা পাল

মাতৃবন্দনা বলতে আমরা মায়ের পূজা করাকেই বুঝে থাকি। সেই মা জাগতিক কিংবা পারমার্থিক যেই হোক না কেন। মাকে পূজা করলে প্রকারান্তরে ভগবানেরই পূজা করা হয়। মাতৃবন্দনা সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করার পূর্বে একবার জগৎ সৃষ্টির মূলে ফিরে তাকাই। কিভাবে জগৎ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের সৃষ্টি হল।

আমরা জানি, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। "এক" মানে তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত আছেন এবং "অদ্বিতীয়" মানে তিনিই আবার বহু অংশে বিভাজিত হয়ে জগতের প্রতিপালন করছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা একম্ পুরুষের মধ্যে জাগরিত হওয়া মাএই "প্রকৃতি" ও "পুরুষ" রুপে বিভাজিত হলেন। শ্রীমদ্ভগবত্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে ´প্রকৃতি ´ ও ´পুরুষ ´ সম্পর্কে বিষদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। জগতের সবকিছু সৃষ্টির মূলে `প্রকৃতি` ও `পুরুষ` এরই অবদান।

`প্রকৃতি` তারপর তিন গুনের প্রতীকরুপে তিন প্রধান শক্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেই প্রধান তিন শক্তি হল: সত্ত্বগুণের প্রতীকরুপে মা স্বরস্বতী; রজোগুণের প্রতীকরুপে মা লক্ষী এবং তমোগুণের প্রতীকরুপে মা দুর্গা। সমস্ত জ্ঞান শক্তির অধীশ্বরী হলেন দেবী স্বরস্বতী। স্বরস্বতী দেবীকে আবার বাগ্দেবী, সারদা, বীণাপানি, বিদ্যাদায়িনী, পুস্ত্তকধারিনী ইত্যাদি বহু নামে বন্দনা করা হয়। সত্ত্বগুণ সর্বদা কোমল, সতেজ ও শুভ্রতার প্রতীক। স্বরস্বতী দেবীও তেমনি শুভ্রবস্ত্র ও অলংকারে সুশোভিত।

শাস্ত্র ও গ্রন্থে দেবী স্বরস্বতী কোথাও দুই হস্তবিশিষ্ট আবার কোথাও কোথাও চারিহস্তে সুশোভিত হতে দেখা যায়। চর্তুহস্তের এক হস্তে কমন্ডুল, একহস্তে মালা আর বাকী দুই হস্তে বীণা ধারণ করে আছেন। দেবীর বাহন কোথাও হংস আবার কোথাও ময়ূর দেখা যায়। শাস্ত্রানুসারে এেতাযুগে দেবী স্বরস্বতী চর্তুহস্তবিশিষ্ট এবং বাহন ময়ূর এই প্রতীকরুপে পূজা করা হতো।

বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুপে দেবীকে পূজা করে থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও দূর্গাপূজার সম্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে দেবী সরস্বতির বন্দনা ও পূজার্চনা করে। সেখানে প্রথমা থেকে নবমী পর্যন্ত পূজা করে। একে আবার `নবরাত্রি` ও বলা হয়। বিদ্যার্থী ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা অষ্টমী তিথিতে মায়ের সামনে পুস্তকাদি রাখেন আর তা দশমীর দিনে পূজা সমাপনের পর নেন। তাদের বিশ্বাস এতে দেবী তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী করবেন। সেই অঞ্চলে ঘরে ঘরে সে সময় দেবী পূজা হয়ে থাকে। গুজরাটীরা আবার দীপাবলী তিথিতে মহালক্ষী, শ্রীগণেশ এবং মহাবিদ্যার পূজা করে থাকেন।

আবার বাংলার পুরো অংশসহ অনেক স্থানে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতির বন্দনা ও আরাধনা করে। একে বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী তিথিও বলা হয়। সেই সময় বাসাবাড়ীতে ও বিশেষ করে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যার্থীরা দেবীর বিশেষ আরাধনে ব্রতী হন। পূজোর দিন এ দেবীর সামনে পুস্তক রাখা হয় এবং সেইদিন পুস্তক পড়া বারণ। ভারতবর্ষে বিদ্যার্থীরা বিশেষ করে প্রত্যহ দেবী বন্দনা করে থাকে মেধা, শক্ত্তি, স্মৃতি ও একাগ্রতার জন্য। দেবীর প্রত্যহ প্রণাম মন্ত্র হলো:

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরুপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহী নমোহস্তুতে।।

বর্তমানে সমস্ত বিশ্বে `YOGA` নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে সেখানেও দেখা যায় কুন্ডলীনি শক্তিকে জাগরিত করার জন্য দেবী বন্দনা করা হয়। আবার শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই সমস্ত কর্মের সিদ্ধিতা প্রদানকারী শ্রীগণেশ মাতৃআজ্ঞা পালনকেই সর্বোপরি রেখেছেন এবং মাতা-পিতার পূজাকেই প্রকারান্তরে শ্রীভগবানের পূজা বলে

আখ্যায়িত করেছেন। কেননা মাকে যে রুপেই বন্দনা করা হোক না কেন তিনি সর্বদা জগেতর সমস্ত সন্তানের দুঃখ দূর করার জন্য সদা তৎপর থাকেন। তাই আমাদের কায়-মনোবাক্যে সর্বদা মাতৃ আরাধনা করা উচিত।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাই, মাতৃবন্দনা সবসময় বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা সহকারে দেখা হয়েছে। জাগতিক মাতা হলো পারমার্থিক মাতার প্রতিরুপ। তাই জাগতিক মাতাকে অবজ্ঞা নয় সর্বদা সম্মান করা উচিত। সবশেষে মায়ের চরণে প্রণতি জানিয়ে আমার লিখার ইতি টানছি-

হে মাত: জগতজননী গো তুমি।
প্রণমি তোমারে বারে বারে।।

Anwesha Biswas

Shahid Tirtha

Moumita Biswas

India's heroes are changing—from Bollywood stars and cricketers to our soldiers, scientists, social workers, and athletes—people who are untiringly and selflessly serving the nation to protect her sovereignty or glorify her in various fields on the international arena. Today, the average Indian takes pride in the achievements of his/her fellow countrymen and women, and a nationalistic fervor runs through the subcontinent every time we see the tricolor flying high, be it on foreign soil when her able daughters and sons earn medals after stiff competition, or in extraterrestrial space etched on the chassis of space crafts, feats that are still beyond the comprehension of other developing nations. Despite all the challenges encountered in nurturing the dream of our forefathers in creating a strong, independent, tolerant, coherent, and self-reliant nation of myriad ethnicities, socio-economic backgrounds, and linguo-cultural differences—a dream so fragile that one is afraid that it may simply vanish if whispered—India has survived and emerged strong, an emerging global power to reckon with. However, a people without knowledge of its history are like trees without roots or buildings without foundation, which will eventually collapse. One of the strongest nations are those that are aware of their past and honor their heroes, both from the past and the present, because someone correctly said that the present is born from the womb of the past. Unfortunately, we Indians are slowly distancing ourselves from our history and heritage, forgetting our national heroes of the past, or are not even aware of the sacrifices that have ensured that we have a today and possibly a better tomorrow. Jatindranath Mukhopadhyay, popularly known as Bagha Jatin, is one such unsung national hero about whom I wish to write on this august occasion.

We live in Bhubaneswar, the city of temples, well known for the famous Lingaraj and Mukteshwar temples, and its proximity to Jagannath dham Puri and the Konark sun temple. Approximately 200 km from Bhubaneswar is the city of Balasore, which is popular for its proximity to the vanishing Chandipur sea beach. Few kilometers from the sea beach is the confluence of the Buribalam or Budhabalanga river with the Bay of Bengal. While the walk to the confluence along the Casuarina-lined sea beach, collecting various types of sea shells *en route* and watching the red crabs play hide and seek is certainly enchanting, what piqued my interest was the association of the place with the immense courage of a group of five young Bengali men, led by Bagha Jatin, who fell fighting a large consignment of British forces for the sake of the motherland in September 1915.

Jatindranath Mukhopadhyay was born in 1879 in Kayagram, a village in the Kushtia subdivision of Nadia district in what is now Bangladesh. In 1904, a young Jatin fought single handedly with a Royal Bengal tiger and killed it with a dagger, because of which he earned the loving epithet 'Bagha Jatin'. Since his childhood, Jatin had a selfless social serving streak compounded with a sense of nationalism, which found direction under the mentorship of Swami Vivekananda. Swamiji had inspired Jatin to take up the mission of bringing together dedicated youth with "iron muscles" and "nerves of steel" who could plunge into the service of the motherland.

Later, his meeting with Sri Aurobindo (then Aurobindo Ghosh) ignited his fervor for revolution against the British further. It was Aurobindo who entrusted him to create a "secret society" for training

dedicated youth for a revolution against the British. That secret society was known as Jugantar and Bagha Jatin became its commander-in-chief. This was a decentralized federated body with scores of autonomous regional revolutionary units. He was also one of the founders of the Anushilan Samiti, the principal revolutionary organization operating in Bengal in the early 20th century. Jugantar soon became a pan-India movement and successfully set up its units across India and even far across South-East Asia, Europe, and America! To raise ammunition, Bagha Jatin set up a bomb manufacturing unit at Deoghar. His party was also instrumental in the assassination of several eminent British officials and in the armed robbery of British banks (which were incidentally replete with the hard-earned money of Indians). It was an era of Indian liberation movement where Hindutva, cultural nationalism, and socialism blended in the focal point of the revolution against the British Raj.

Jatin was first arrested in the Alipore Bomb Case, but was released shortly thereafter. He was again arrested in connection with the Howrah-Sibpur case and was released after 11 months. It was at this time that Jatin realized that the sporadic armed attacks on the much stronger British dominion were insufficient and that the time was ripe for galvanizing an all India uprising similar to the 1857 mutiny. Working on the principle that “my enemy’s enemy is my friend”, Bagha Jatin approached the German Crown Prince in Kolkata in 1912 for the delivery of arms for an insurrection to create a socialist government in India. Impressed, the Crown Prince assured Jatin of assistance in terms of arms, ammunition, and funds at a suitable time. Then, the World War I broke out in 1914, with Germany and Great Britain as adversaries. A large contingent of the British-Indian army was sent to the war front to help with the British war efforts, leaving only 15,000 soldiers to guard the Indian soil. Jatin saw this as the opportune moment to strike the death blow to the British in India. By this time, the Jugantar party had forged strong ties with the expatriate Indian revolutionary outfits based, and Jatin was secretly working on winning over the Indian soldiers stationed at Kolkata’s Fort William, the nerve center of the British in India. The task of obtaining funds and armaments was entrusted upon MN Roy, the key lieutenant of Jatin. In April, 1915, Roy left India for Indonesia in search of German armaments on board the SS Maverick, which was believed to be *en route* somewhere in the Pacific. Odisha’s Balasore coast was selected as the place where the shipload of the arms consignment from Germany was supposed to be delivered. To escape the British radar and spearhead the next phase of the operation, Jatin fled from Kolkata and went into hiding at the Kaptipada village near Balasore.

Unfortunately, destiny had other plans. The German ship, SS Maverick, never reached the Indian shore as the plan was leaked to the British intelligence. Working on tip-offs and intercepted clues, a team of the British police raided Kaptipada. However, Jatin and his comrades, Jatish Pal, Chittapriya Ray Chaudhuri, Niren Dasgupta, and Manoranjan Sengupta, successfully evaded the raid and walked for two days through the forests and hills of the Mayurbhanj district to reach the Balasore railway station. As the police had announced a reward for the capture of five fleeing "bandits", the local villagers were also in pursuit. With occasional skirmishes, the revolutionaries, running through jungles and marshy land in torrential rain, finally took up position on 9 September 1915 in an improvised trench in the undergrowth on a hillock at Chashakhand in Balasore. The contingent of Government forces, led by Charles Tegart, approached them in pincer movement. A gunfight ensued, lasting seventy-five minutes, between the five revolutionaries armed with Mauser pistols and the large number of police and army armed with modern rifles. It ended with an unrecorded number of casualties on the Government side; on the revolutionary side, Chittapriya Ray Chaudhuri died, Jatin and Jatish were seriously wounded, and Manoranjan Sengupta and Niren Dasgupta were captured after their ammunition ran out. Bagha Jatin succumbed to his injuries in a Balasore hospital on 10 September

1915, Manoranjan and Niren were executed in Balasore jail, and Jatish was deported to the Andamans. Minutes before he breathed his last, Bagha Jatin had said that he was extremely happy that every drop of his blood had been shed in the worship of Mother India.
Although the armed uprising could not take off, Bagha Jatin's martyrdom and the battle of Balasore galvanized the fight against British Raj. His clarion call "Amra morbo, jagat jagbe" (We shall die to awaken the nation) evoked the spirit of the Indian Independence Movement and was a precursor to Netaji Subhas Chandra Bose's armed struggle to throw the British out of India after almost 30 years. No wonder that rebel poet Kazi Nazrul Islam had compared this event to the "Battle of Haldighat" where Maharana Pratap, who had been militarily defeated, had nonetheless ignited the flame of patriotism.

Living for a short span of 36 years, Bagha Jatin left his footprints on the sands of time. Often described as a thinker in action, Bagha Jatin was a believer of total freedom when conventional Indian nationalism could not even contemplate India's independence. Dr Shyama Prasad Mookerjee wrote: "Jatindranath was the well-known and principal leader of the second episode in the history of the revolutionary movement who belonged to that band of fighters, who had written a blood-red chapter of their country's fight for freedom. Sacrificing all they had…they rushed to the ritual call of death, and inch by inch, by shedding their lives, they had left for us the relish of a greater life." Struck by his heroism, Charles Tegart, then the colonial top cop in India, wrote in a note: "Bagha Jatin, the Bengali revolutionary, is one of the most selfless political workers in India. His driving power is immense: if an Army could be raised or arms could reach an Indian port, the British would lose the War."

Today, a neglected park and a memorial to the great martyr stands at Chasakhand, which sees spurt of activity only around 10th September every year on the occasion of Bagha Jatin's death anniversary, while it stands a victim to government apathy for the rest of the year. Thanks to the way the nation's history has been scripted for the new generation of independent India, the contribution of Bagha Jatin and his comrades are gradually being forgotten. It is high time that Bagha Jatin's legacy is retold to guide the nation, nationalism, and nationhood.

"তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়েছ,
তাইতো দেশের খেয়া তরী তোমাকে বহিতে পারেনা, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়,
তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহার পর্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে চায়,
কোন বিস্মৃত অতিতে তোমার জন্যই তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল,
কারাগার তো তোমাকে মনে করিয়াই নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব,
তোমাকে অবহেলা করিবে কার সাধ্য,
এইযে বিপুল সৈন্য ভার, এই অগণিত প্রহরি, এ সবই তোমার জন্য,
দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে পার বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন,
মুক্তিপথের অগ্রদূত, পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রহী, তোমাকে শত কোটি নমস্কার"।

(From Sarat Chandra Chattopadhyay's Pather Dabi)

অনেক দিন

উদ্দালক ভরদ্বাজ

অনেক দিন তোমার সাথে কথা হয় না;
অনেক দিন তোমার মাতোয়ারা হাসির
তুলনা, রোদের উচ্ছল ঝরনার সাথে
করা হয় না।
অনেক দিন তোমাকে বলা হয় না
আমার কবিতায় আর ঠিক কটা শব্দ,
কোনখানে বসলে-
অক্ষয় কাব্য রচনা হতে পারত।

অনেক দিন তোমার সাথে দেখা হয় না;
অনেক দিন, তোমার পুরনো পাড়ার, সেই
বড় দাড়িওলা মামা বাবুর
হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার গল্প
করা হয় না।
অনেক দিন তোমার চোখের পাশে তিল,
অনেক দিন তোমার এক-কানে-পরা সাদা দুল,
অনেক দিন তোমার মেটে রঙ্গে ছোপানো পোলকা ডটস-

অনেক দিন তোমার কাঁধে হাত রেখে
একটু ঝুঁকে, কানে কানে বলা হয় না,
"যাবি?"

এক দিন ভাবি নি এরকম হবে,
এক দিন ভাবি নি সময়-ও ফুরোবে-
এক দিন দুনিয়া-কাঁপানো দম্ভে-
তীক্ষ্ণ নীল ভালবাসায় বিশ্বাস করেছি।

অথচ এখন, ছায়াছন্ন বিবর-
অবসন্ন, ক্লিন্ন বাস স্ট্যান্ড,
নিয়মের ব্যতিরেকেও শ্রান্ত সময়-
দু হাতে আঁধার সরায়, আর ভাবে-

অনেক, অনেক দিন তোমায় ভালবাসা হয় না।

লিংশপিং শহরের প্রথম বর্ষের (২০১৮) শারোদৎসব

সৌমিকা কাপাসী পাল

শারদ উৎসব হলো আপামর ভারতীয়র একটি প্রিয় উৎসব। আমরা প্রবাসী ভারতীয়রা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের মন এই সময় উদাস হয়ে ওঠে। আমাদের স্মৃতিপটে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে সেই ছেলেবেলার শিশির ভেজা সকাল, শিউলি ফুলের গন্ধ, আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘরাশি, ঘাসফুলের অদ্ভুতছন্দে মাথা দোলানো। এটা ঠিক আমরা ভারতীয়রা এই মন মাতোয়ারা পরিবেশ উপভোগ করতে পারি না, কিন্তু তাতে আমাদের শারদ উৎসবের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ কমেনি। আর আমাদের সকলের সম্মিলিত আকর্ষণের পরিনাম হলো সুইডেনের লিংশপিং শহরের প্রথম বর্ষের (২০১৮) দুর্গাপূজা। স্থান ও পরিস্থিতি ভেদে নিয়ম ও সময় এর কিছু পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে আমাদের উৎসাহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সামান্যতম ভাটা পড়েনি কারণ আমরা জানি ভগবান শ্রী রামচন্দ্রও দেবীর আরাধনায় অকালবোধন করেছিলেন।

আমাদের এই দুই দিনব্যাপী উৎসবে (১৩ -১৪ ই অক্টোবর, ২০১৮) প্রায় ৪৫০ জন মানুষের সমাগম হয়েছিল। আমাদের কয়েক ঘর ভারতীয়র পক্ষে এত বড় উৎসবের আয়োজন করা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ছিল। তাহোক তবু আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে এই বছর আমাদের এই শহর লিংশপিংয়ে মাতৃশক্তির আগমন ও আরাধনা হবেই। বেশ কিছু শ্রমসাধ্য কাজ ছিল, যেমন কলকাতা থেকে মায়ের মূর্তি ও অনান্যা সামগ্রী আনা, উৎসবের ওয়েবপেজ তৈরি করা, উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের আপ্যায়ন করা এবং প্রসাদ ও আহারের ব্যবস্থা করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের জন্য কলাকুশলীদের এর তালিকা প্রস্তুত করা, পূজার সাজসজ্জার আয়োজন করা, ইত্যাদি। তবে সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মা লক্ষ্মীর কৃপা। কারণ এখানে সব কিছুর মূল্য অধিক। তাই আমাদের সাধ্য ও সাধনার মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কথায় আছে যে মনের সংকল্প যেখানে প্রবল সেখানে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক নয়। অনেক মাপ পরিমাপ, বিচার-বিশ্লেষণ, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের পরে অবশেষে সব কিছু সংকুলান করতে আমরা সমর্থ হই।

আমাদের কাছে বিশেষ উৎসাহপ্রদ ছিল যে বেশকিছু পরিবার সুইডেনের অন্যান্য শহর থেকে আমাদের উৎসবে যোগদান করে আমাদের বিশেষ আনন্দবর্ধন করেছিলেন, আর বিনিময়ে তারা ততোধিক আনন্দ নিয়ে ফিরেছিলেন। আমাদের উৎসবে সন্ধিপূজার সময় সমারহ ছিল চোখে পরার মত । মায়ের আরতি করা, অঞ্জলী দেওয়া এবং প্রদীপ জ্বালার মধ্যদিয়ে সকলে এক ভাবতন্ময়তার জগতে প্রবেশ করেছিল। বিশেষকরে মহিলাদের সিঁন্দুর খেলার প্রতি আকর্ষণ ছিল বর্ণনাতীত। পূজার শেষে সকল মহিলারা একে অপরের গালে সিঁন্দুর মাখান এবং

সমবেত নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। আমাদের বিশেষ সংযোজন ছিল যে সুইডেনের একটি বড় খবরের কাগজ Corren আমাদের উৎসবের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিল।

আমাদের দুই দিন ব্যাপি উৎসবের প্রত্যেক দিনই বিশেষ সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । সাংস্কৃতিক কলাকুশলীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ছিলেন; এ ছাড়াও লিংশপিং শহর ও সুইডেনের অন্যান শহর এমনকি জার্মানী থেকেও কলাকুশলীরা আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্টানে ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীত, দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য, রবীন্দ্রসংগীত, বলিউড নৃত্য, ভজন, ওডিশি নৃত্য, গীতিনাট্য, সমবেত সংগীত ইত্যাদি পরিবেশিত হয়েছিল । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে আমাদের উৎসব প্রাঙ্গনে সমগ্র ভারতবর্ষের একটি চিত্র ফুটে উঠেছিল যেটা আমাদের উৎসবকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। বিশেষ করে আমাদের এই মাতৃ আরাধনার অন্তর্নিহিত অর্থ সকলকে সম্মোহিত করেছিল। সর্বপরি আমাদের এই দূর্গোৎসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সীমা ছাড়িয়ে এক সাংস্কৃতিক মহামিলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
এ যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি -"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে"-এর সার্থক রূপায়ণ।

Srinivasan Anand

Trappings of a seeker

রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান / Tagore's MOSAIC SONGS

Santanu Dasgupta

Music has remained a constant throughout Tagore's creative life and like his all work and thoughts it has evolved all the time.

Tagore grew up in a musical atmosphere; music was an integral part of his education and young Rabi was exposed to both Indian and Western classical music as well as Bengali folk and popular music such as "Toppa", "Baul" and "Kirtan". He was sent to England to learn English etiquettes and study law. Studies were neglected; he spent his time observing the society and culture closely and was strongly influenced by the beauty, complexity and diversity of English music, Irish and Scottish ballads and Operas. He was particularly impressed by the ease with which western music could convey everyday emotions such as laughter, merriment, anger etc. through songs, an aspect he thought was lacking in Indian music. He created the first Bengali opera or musicaldrama (Geeti Natya) "Valmiki Pratibha" following such structures in which even conversations were set to music.

Later, in Selaidah as Tagore family's estate manager, Rabindranath lived in a houseboat. The natural beauty of the East Bengal's rivers and villages gave his music a fresh burst of life. He incorporated the spiritual and emotional moods of different ragas into his compositions giving them distinct associations with seasons or times of the day or moods. Sufi literature and music made a deep impact on Tagore and many of his songs were thematically and musically structured after the folk forms of Bengal's music: Baul, Bhatiyali and Kirtan. Tagore brought these folk and street forms into the musical mainstream of Bengal.

Tagore gave his songs an intimate coherence between the lyrics and the musical melody to create a unique style called Rabindrasangeet. Various musical influences such as Hindusthani and Karnatak classical music, Bengali and other regional folk music and even Western music (both classical and popular songs) have been freely used to bring out the intended flavor or mood or feeling. Almost ten percent of all Tagore's songs have blended various influences of diverse Indian classical or folk music as well as Western ballad forming a unique mosaic of melody structures and fall into a category called "Bhanga Gaan". Most of these are direct conversion into Rabindrasangeet from various Bengali or non-Bengali songs which attracted the poet-composer by their lyrical beauty or magical tune or rhythmic structure. These are neither mere translation nor putting new lyrics to an existing tune – but "Trans-creation" into a new song with an identity of its own without any apparent connection with the original.

Ever an experimentalist, Tagore often composed the same lyrics into different melody structure to fit the song into a different context. Many of his songs were converted into a song of entirely different tune and placed into a drama as parts of conversation or musical descriptions of the story lines. Only a master of word- craft and a musical genius could do it with such ease and fluency. These songs bearing borrowed tunes or melodies from Indian and western musical traditions are so seamlessly put together that they are indistinguishable from other completely original Tagore songs.

কালীতীর্থ কালীঘাটঃ ইতিহাসের হাতছানি

শুভদীপ রায় চৌধুরী

পীঠমালায় দেখা যায়, কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়ে বলে অঞ্চলটি পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানকার দেবতা কালী ও পীঠ রক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বর। চূড়ামণি তন্ত্রে বলা হয়েছে,

"নকুলেশঃ কালীঘাটে দক্ষপাদাঙ্গুলিষু চ।

সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।।"

সতী স্নেহবশত শিব-লিঙ্গরূপ ধারণ করে কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করছেন এবং ব্রহ্মা এখানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করেন।

হিন্দুতীর্থের মধ্যে ৫১টি পীঠস্থান বলে চিহ্নিত। সেই পীঠস্থানের অন্যতম হল মহাতীর্থ কালীঘাট। পীঠস্থানগুলি শক্তিপূজার প্রধান স্থান। কী কারণে পীঠস্থান হল তা পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। পূর্বকালে প্রজাপতি দক্ষ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষি পরিসেবিত পবিত্র হরিদ্বারে বৃহস্পতিসব নামে যজ্ঞ বিশেষের আয়োজন করেন এবং সেখানে ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ও দেবগণকে আমন্ত্রন করেন। কিন্তু তাঁর নিজের জামাই শিবের প্রতি বিদ্বেষ থাকার জন্য তিনি তাঁহাকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেননি। দক্ষকন্যা সতী পিতৃযজ্ঞ মহোৎসবের কথা শুনে তাঁর পিতার গৃহে যাওয়ার জন্য তাঁর পতি শিবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। সতী পিতৃগৃহে গিয়ে দেখলেন সেখানে রুদ্রের ভাগ নেই। দক্ষ তাঁর কন্যার আদর না করে শিবনিন্দা করতে শুরু করলেন। এই কথায় সতী অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞে দেহ পরিত্যাগ করেন। এই সংবাদে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করেন এবং সতীর মৃতদেহ নিজের স্কন্ধে নিয়ে উন্মত্তের মতন নৃত্য করতে করতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। বিষ্ণু তখন সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রের দ্বারা খণ্ড করে ফেললেন। যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হল সেই সেই স্থানে মহাদেব সতীস্নেহ বশত স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হলেন। ব্রহ্মা সেইখানে শক্তির এক এক মূর্তি স্থাপন করলেন। সতী অঙ্গ ৫১টি খণ্ড হয়েছিল সুতরাং ৫১পীঠস্থান হল। যেমন কাশীতে "কালভৈরব"-সতী হলেন দেবী বিশালাক্ষী। উৎকলে পড়েছিল নাভি-দেবী বিমলা,ভৈরব জগন্নাথ। কামাক্ষায় পড়েছিল দেবীর যোনী, ভৈরব উমানন্দ। কুরুক্ষেত্রে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ পায়ের গুলফ-দেবী হয়েছেন সাবিত্রী, ভৈরব স্থানু।তেমনই কালীক্ষেত্র কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পদের চারটি আঙুল পড়েছিল। তাই একান্নটি সতীপীঠ বা শক্তিপীঠের মধ্যে কালীতীর্থ কালীঘাট একচল্লিশতম সতীপীঠ।

সুদর্শন ছিন্ন সতীঅঙ্গ নিপাতিত হয়ে যতটুকু স্থান কালীঘাটে পড়েছিল তা নিগমকল্পের পীঠমালায় বর্ণিত আছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

"মাতঃ পরাৎ পরে দেবী সর্ব্বজ্ঞানময়ীশ্বরী।

ক্ষেত্রানাং কথ্যতে দেবী কালীক্ষেত্রং বিশেষত দেব্যুবাচ।

"দক্ষিণেশ্বর মারভ্য যাবচ্চবহুলা পুরী।

ধনুরাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয় সংখ্যকং।।

তন্মধ্যে ত্রিকোণাকার ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্ম্যকং।

মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।।

নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।

তত্র ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভং।।

কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্র মভেদোপি মহেশ্বরঃ।।

কীটোহপি মরণেমুক্তি কিং পুনর্ম্মানবাদয়ঃ।

ভৈরবী বগলা বিদ্যা(কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা।

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডীচ্যাষ্ঠশক্তি বসেৎ সদা।।"

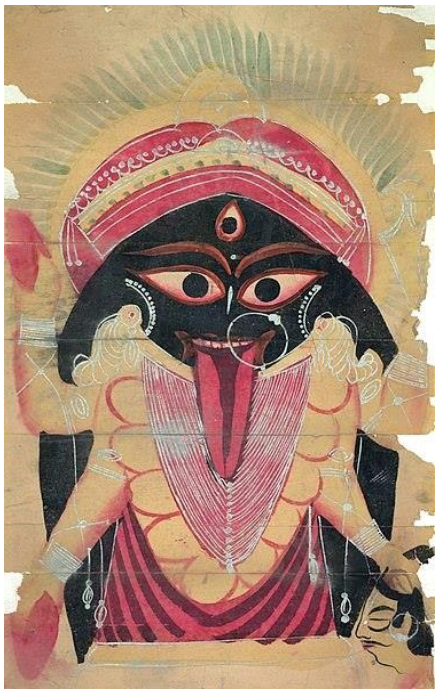

Old Kalighat painting from 19th century

দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলা(কালীঘাটের দক্ষিণবর্তী রাজপুরের কিছু দক্ষিণ পূর্ব আকনা গ্রামের সন্নিকট স্থান বোলপুর নামে খ্যাত)পর্যন্ত দু-যোজন অর্থাৎ(২*৪) ক্রোশব্যাপী এলাকাই কালীক্ষেত্র। এর মধ্যে একক্রোশ পরিমিত ত্রিকোণাকার ক্ষেত্রের মধ্যে কালিকাদেবী বিরাজমানা। যেখানে নকুলেশ ভৈরব এবং গঙ্গা বিরাজ করেন সেই স্থান মহাপুণ্যক্ষেত্র। কাশীক্ষেত্র ও কালীক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এই মহাপুণ্যস্থানে ভৈরবী,বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও চণ্ডী এই সনাতনী অষ্টশক্তি অবস্থান করেন। যে জায়গাটিকে এখন কালীঘাট বলা হয়, বিশেষ কোনও প্রাচীন নাম না থাকলেও তা যে পুরাণের "সমতট" প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা দক্ষিণ বাংলার রসাতল প্রবেশের বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন। তাদের মতে কলকাতি ও তার কাছে জায়গাগুলি ক্রমশ নীচের দিকে এগিয়ে গেছে। এইসব প্রাচীন ক্ষেত্রগুলি ওপর দিক থেকে অনেকটাই বসে গেছে। এরদ্বারা বোঝা যায়, যে জায়গাটি এখন কালীঘাট হিসাবে চিহ্নিত করা আছে, তার অনেক নীচের জমিতে অনেকদিন আগে মানুষেরা বসবাস করতেন। ক্রমশ রসাতলব চলব যাওয়ায় জায়গাটি মানবশূন্য হয়ে যায়। ফলে এই জায়গাটি আবার মানুষের বাসযোগ্য হওয়ার সময় লাগে।

ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখন্ডে লিখিত আছে-"গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে।"

কালীক্ষেত্র কালীঘাট বহু প্রাচীন তীর্থস্থান। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু তীর্থ বিষয়ক গ্রন্থে কালীঘাটের নামোল্লেখ করে দেবী কালিকার উদ্দ্যেশ্যে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। কিছুকিছু তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় কালীঘাট বা কালীঘট্ট বা কালীক্ষেত্র বল্লাল সেন যুগেরও প্রাচীন।

তীর্থ কালীঘাটের মন্দির সৃষ্টি ও মূর্তি স্থাপনের ব্যাপারে বাংলার প্রাচীন জমিদার বংশীয় সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারই উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছিলেন ১৫৬৯সাল থেকে-

"লক্ষ্মীর আরাধ্য কালী, যাহে স্থিরামতি।
অদূরে বড়িশা তথা করিল বসতি।
যথাকালে কালীঘাটে কালিকার স্থিতি।
লক্ষ্মীনাথে কুলভাঙ্গে সাবর্ণে মতি।।
মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ
কালীঘাটে পায় নাম লক্ষ্মীনারায়ণ....।।"

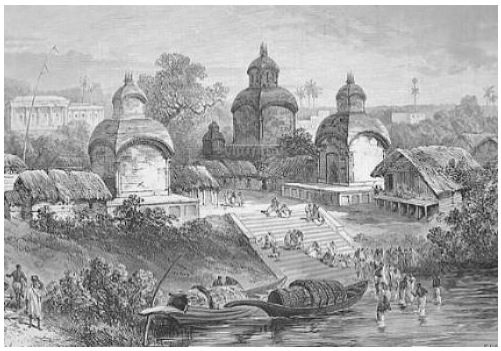

Kalighat Temple - 1887

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীন কৃষ্টিসম্পন্ন জমিদারবংশ।

আশ্বিন মাসের লক্ষ্মীপুজোর তিথি হিন্দুর পঞ্জিকায় অতি শুভদিন। ৯৭৭বঙ্গাব্দের(১৫৭০সাল) এই দিন অপরাহ্ন ৪/১৫ মিনিটের সময় লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয়। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন জন্ম বলে তাঁর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মীকান্ত। লক্ষ্মীকান্তের জন্মের আগে কামদেব ওরফে জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীদেবীর সন্তান না হওয়ায় আত্মীয়-স্বজনগন বললেন, কালীঘাটে গিয়ে তাদের পারিবারিক দেবতা দেবী কালিকার কাছে পুত্রকামনায় তিনদিন তিনরাত্রি ধরে সাধনার জন্য। তৃতীয়দিন রাত্রিকালে কালীমন্দিরের পুষ্করিণীর জলের ওপর এক আলোর ছটা দেখতে পান পদ্মাবতীদেবী। পরদিন ওই পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তিনি জলের তলায় সতীর দেহাংশ দেখতে পান ও দৈববাণী শ্রবণ করেন। সেই দৈববাণী শুনে দেবীর প্রধান পুরোহিত আত্মারাম ঠাকুর পুকুরের তলা থেকে দেবীর সতীঅংশের উদ্ধার করেন। ১৫৭০সালে আষাঢ় মাস স্নান পূর্নিমা তিথিতে একটি লাল পট্টবস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবী কালিকা। শুরু হল সতীর নিত্য পূজাপাঠ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৫৬৯সালে হালিশহর থেকে সাবর্ণ গোত্রীয় দম্পতি যখন কালীঘাটে এলেন তখন কালীঘাটের প্রধান পুরোহিত ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শ্রীমৎ আত্মারাম ঠাকুরের থেকে তন্ত্রমতে দীক্ষা নিলেন জীয়া গঙ্গোপাধ্যায় এবং পদ্মাবতীদেবী।

প্রসঙ্গত লক্ষ্মীকান্তের জন্মের পর তার মা পদ্মাবতীদেবী মারা গেলেন। লক্ষ্মীকান্তকে কালীঘাটের রেখে কামদেব বেরিয়ে পড়লেন। শেষে তিনি কাশীতে ছিলেন ও কামদেব ব্রহ্মচারী রূপে ভারত বিখ্যাত সাধকে পরিনত হয়েছিলেন। কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বাড়তে থাকেন তাঁর গুরু মহাত্মা আত্মারাম ঠাকুরের কাছে। পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত হন। বঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে দমন করে মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তের বিদ্যাবত্তা এবং যশোর তালুকের নায়েব থাকাকালীন প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তার দক্ষতার বিষয়ে অবগত হলেন। সেই সমস্ত কথা শুনে মানসিংহ কালীঘাটে লক্ষ্মীকান্তের সাথে দেখা করেন এবং তাকে বলে যে তার পিতা কামদেবের শিষ্য তিনি(মানসিংহ), পিতার নির্দেশে তিনি তাঁকে(লক্ষ্মীকান্তকে) গুরুদক্ষিনা প্রদান করতে চান। লক্ষ্মীকান্তের ব্যবহার, পাণ্ডিত্য, উপস্থিতবুদ্ধি দেখে অভিভূত হয়ে মানসিংহ তাকে "মজুমদার"(রাজস্ব কমিশনার) পদমর্যাদায় ভূষিত করলেন।

মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, আমীরাবাদ, হাবেলীসহর ও হাতিয়াগড়।

"জায়ো সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্ পাণ্ডিত্যে অসীম।

তা দেখি মানসিংহ করে ভক্তি অনুপম।।

তাই মানসিংহ তাঁর অতিশয় ভক্ত।

তাঁর দীক্ষা শিক্ষায় ত্রিতাপে অনাসক্ত।।

গুরুর আশীষে শিষ্য মানবে সিংহ। ভারতজয়ী হল যে রাজা মানসিংহ।।

কি কাজে গুরুর তোষ? ইঙ্গিতে তা শুনি।

তব ভ্রাতৃ অন্বেষণ কর যাদুমণি।।

মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ।

কালীঘাটে দেখা নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।।

শিষ্ট, শান্ত, সুবুদ্ধি, তেজিয়ান অতি।

বালক হলেও বিজ্ঞ আছিল সুমতি...।।"

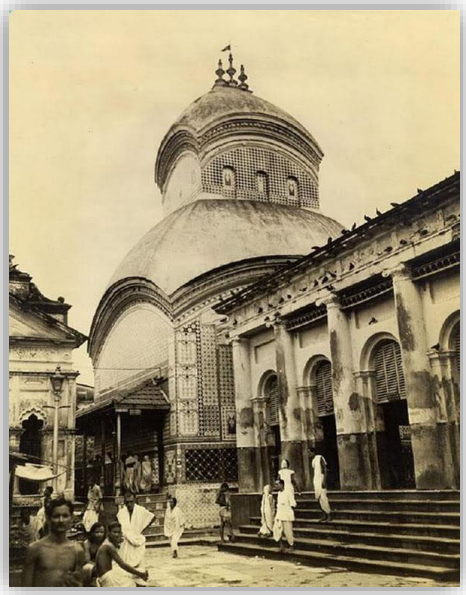

কালীক্ষেত্রের কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কারের বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমান কালীমন্দিরের অনতিদূরে পর্ণকুটীরে কোন ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক তপস্যা করছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় ভাগীরথী সলিলে সন্ধ্যা বন্ধনাদি পাঠ করছেন এমন সময় অনতিদূরে এক আলোকজ্যোতির সন্ধান পান। সেই আলোকজ্যোতি দেখে ব্রাহ্মণের কৌতুহল বৃদ্ধি হল এবং তিনি ওইদিকে(কালীকুণ্ডের) গিয়ে দেখলেন ওই দিব্য আলো নিঃসৃত হয়েছে। পরে কালীর প্রত্যাদেশ মতে জানতে পারলেন যে পূর্বকালে সুদর্শন ছিন্ন হয়ে তাঁরই অঙ্গ ওইস্থানে পতিত হয়েছিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করতে করতে অদূরে স্বয়ম্ভু নকুলেশ্বর রয়েছেন দেখতে পেলেন। এবং তিনি ওই স্থানে উক্ত প্রস্তরবৎ সতীঅঙ্গ যত্নপূর্বক রেখে কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

আবারও অন্যমতে ব্রহ্মানন্দগিরি এবং আত্মারাম ঠাকুর মহামূল্যবান কষ্টিপাথরে দক্ষিণাকালী মাতার রূপদান করেছিলেন সাবর্ণ গোত্রীয় রায় চৌধুরীদের কুলমাতা মা ভুবনেশ্বরীর রূপদেখে ১৫৭০সালে। ওই শিলার মধ্যেই দেবী-কালিকা আবদ্ধা আছেন। কালীঘাট পুণ্য পীঠস্থানরূপে আত্মপ্রকাশের মূলে রয়েছেন মহাতপস্বী দুই সাধক আত্মারাম ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দগিরি। আর রয়েছেন কামদেব ও পদ্মাবতীদেবীর সাধনা ও স্বপ্নাদেশ। শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "প্রাচীন কলিকাতা" বইতে লিখেছেন, পনেরোশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুর(তখনকার কালীঘাট) মা কালীর

পূজার্চনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে সাবর্ণ গোত্রীয় লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়(রায় চৌধুরী) মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের থেকে জায়গির প্রাপ্তির পর তিনিই কালীঘাটের মন্দির তৈরী ও দেবীর সেবার জন্য ব্যবস্থা করে দেন। বলাবাহুল্য যে লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী ৫৯৫বিঘা ৪কাঠা ২ছটাক জমি দান করেছিলেন।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় আরও উল্লেখ করেছেন, গোবিন্দপুরের পুরনো নাম কালীঘাট এবং বর্তমানে যেখানে জি.পি.ও(জেনারেল পোস্ট অফিস) আছে সেখানেই ছিল মা কালীর মন্দির। প্রমথনাথ মল্লিক তাঁর "কলিকাতার কথা" বইতে(আদিকাণ্ড পৃষ্ঠা১-২) লিখেছেন, কালীদেবী কবে কলকাতা হইতে কালীঘাটে যান তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরূহ তবে এই পর্যন্ত শোনা যায় বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল। সেই পুরাতন পাথরে বাঁধান ঘাট হইতে বর্তমান পাথুরিয়াঘাটার নাম হয়েছে যদিও এই মতেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন ধর্মানন্দ মহাভারতী।

ব্রহ্মানন্দের জন্মের আগে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের "মনসাবিজয়"ও সমসাময়িক কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গলে" কলিকাতা এবং কালীঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী গোষ্ঠী বাংলার দক্ষিণ অংশের জমীদারী প্রাপ্ত হয়ে কালীঘাটের কালীমূর্তির আবিষ্কার করেন।

কালীর সেবায়েতগণের মধ্যে ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী কুলব্রহ্মচারীর নাম প্রথম পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর যোগ সাধনায় রত থাকতেন এবং পীঠস্থান নির্জন কালীঘাটে গঙ্গাতীরে বাস করে কালীর সেবা করতেন। একদিন এক গরিব বিধবা ব্রাহ্মণী মন্দিরে দেবীদর্শনে আসেন। সঙ্গে অষ্টাদশী অবিবাহিত কন্যা। নাম যোগমায়া। ভুবনেশ্বরগিরি এই কন্যার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভৈরবীরূপে গ্রহণ করেন। তন্ত্রে ভৈরবী রাখার নির্দেশ আছে। কিছুদিন পরে যোগমায়া এক কন্যার জন্ম দিলেন। নবজাতা শিশুকন্যার নাম রাখলেন উমা। উমার সাথে খানিয়ান গ্রাম নিবাসী ভবানীদাস চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। কারণ ভুবনেশ্বরগিরি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অদ্ভূত দৈববানী পেলেন-"বৎস,ভুবনেশ্বর এবার উমার বিয়ে দিয়ে আমার পূজা কর। সন্ন্যাসীদের রেহাই দিয়ে সংসারীর হাতে তুলে দে।"

ভুবনেশ্বরগিরির অনুরোধে ভবানীদাস কালীঘাটে থেকে গেলেন। দেবীর পূর্বের আদেশমতোন ভুবনেশ্বরগিরি বৈষ্ণব ভবানীদাসের ওপর দক্ষিণা কালিকার পূজা-আরতির ভার দিলেন। এখন থেকেই শুরু হল গৃহীভক্তের হাতে কালীমাতার পূজার্চনা। সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বরগিরিই কালীঘাটের শেষ মোহান্ত। কালীঘাটের বর্তমান মন্দির তৈরী করেন বড়িশার সাবর্ণ গোত্রীয় সন্তোষ রায় চৌধুরী। সন ১২০৯সালের অর্থাৎ ১৮০২।৩ খ্রীঃ দাখিলী ভূমির তায়দাদে দেখা যায় যে ১১৫৭সালে অর্থাৎ ১৭৫১ সালে মনোহর ঘোষাল ও কালীঘাটের তদানীন্তন সেবাইত গোকুলচন্দ্র হালদারকে সন্তোষ রায় চৌধুরী জমীদারীর নানাস্থানে বিস্তর ভূমি দান করেন। ২৪পরগণায় সন্তোষ রায়ে অসীম প্রভুত্ব ছিল। সন্তোষ রায় তদানীন্তন দক্ষিণ প্রদেশের সমাজ অধিপতি ছিলেন। শেষ অবস্থায় সন্তোষ রায় কালীঘাটের কালীর বর্তমান বড় মন্দির নির্মাণ করেন। সন্তোষ রায়ের মৃত্যুর পর প্রায় ৫।৬ বৎসর পরে সাবর্ণ গোত্রীয় রাজীবলোচন রায় চৌধুরী ১৮০৯সালে কালীঘাটের বর্তমান মন্দির স্থাপন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বড়িশার সাবর্ণি জমিদারগণের পূর্ব পুরুষ কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী গঙ্গাতীরে আপন জমীদারী ভক্ত অরণ্য মধ্যে জপ তপাদি করতেন। কালীঠাকুরাণীর প্রত্যাদেশ মতে বর্তমান কালীর প্রস্তর খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হয়ে ওই

কুণ্ডুর পশ্চিম তীরে স্থাপন করেন এবং কালীর সেবার জন্য উক্তস্থানের জমি নির্দিষ্ট করে দিয়ে মনোহর ঘোষাল নামক এক ব্যক্তিকে পরিচারক নিযুক্ত করেন। কালীঘাটের বন কেটে তিনি কালীর ইমারত নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যে স্থানটিকে এখন কালীঘাট বলা হয় তা পূর্বে বড়িশার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী সাবর্ণি চৌধুরীদের জমিদারি ভুক্ত চাঁদপুর গ্রাম বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে বড়িশার সাবর্ণি জমীদার কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা কাশীশ্বর রায় চৌধুরী ওই স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করেন।

কালীঘাটের মন্দিরের মধ্যে এখন কেবল কালীর প্রাপ্ত মুখমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে এমন নয়, এই এখন স্বর্ণাদি নির্মিত, বহুমূল্যের অলঙ্কারাদিতে পরিশোভিত হয়েছে। এইসমস্ত অলংকার বহু ধনাঢ্য লোকের প্রদত্ত। প্রথমে খিদিরপুর নিবাসী স্বর্গীয় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কালীর চারিটি রৌপ্যময় হস্ত করে দেন। বর্তমান চারটি স্বর্ণ নির্মিত হাত প্রদান করেন কলকাতার প্রসিদ্ধ বাবু কালীচরণ মল্লিক মহাশয়। চারহাতের চারগাছি সুবর্ণ কঙ্কণ চড়কডাঙা নিবাসী কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদান করেন। কালীর স্বর্ণজিহ্বাটি পাইকপাড়াধিপতি রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রদান করেন। এইরূপ বহু স্বর্ণালংকার বহু ধনাঢ্য লোকের দ্বারা প্রদান করে।

কালীর মন্দিরের পশ্চিম দিকে শ্যামরায় বিগ্রহের অধিষ্ঠান মন্দিরও দোলমঞ্চ। কালীর সেবাইত হালদারগণ পূর্বপুরুষ ভবানীদাস বৈষ্ণব ছিলেন। শ্যামরায় বিগ্রহ তিনি কালীঘাটে নিয়ে আসেন। ১৭২৩সালে মুর্শিদাবাদের জনৈক কাননগু কালীঘাটে এসে শ্যামরায়ের জন্য ছোটো ঘর প্রস্তুত করে দেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ বাওয়ালীর জমিদাণের পুর্বপুরুষ উদয়নারায়ণ মণ্ডল মহাশয় শ্যামরায়ের ছোটো ঘর ভেঙে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দেন। দোলযাত্রার দিন শ্যামরায়ের প্রধান উৎসব। পূর্বে শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ ছিল না তাই মন্দিরেই দোল পালন করা হত। ১৮৫৮ খ্রীঃ সাহানগর নিবাসী মদন কলে নামক এক ব্যক্তি শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ নির্মাণ করেন।

অতুলকৃষ্ণ রায়ের মতে সতী-অঙ্গ বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলে পড়েছিল, তাই তার নাম চৌরঙ্গী। যদি এই মত সত্য বলে ধরা হয় তাহলে দেবীর মূর্তি ও মন্দির কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলেই হত। তপন চট্টোপাধ্যায়ের "পলাশির যুদ্ধ" লিখেছেন, কালীঘাটের ভদ্রকালী কালিকা কালীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । নকুলেশ্বর মহাদেবের সাথে তিনি সানন্দে বিরাজ করছেন। পূর্ণেন্দু পত্রী "ছড়ায় মোড়া কলকাতা'য়"লিখেছেন, এঁরা(সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারি)মধ্যেই কালীঘাট। বুড়িগঙ্গার তীরে এঁরাই কালীঘাটের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সামাজিক নিয়মে বাধে বলে নিজেরা পুজো করতে পারেন না। তাই দূর দেশ থেকে ডেকে আনা হল হালদার গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ। সেই থেকে ঐ হালদাররাই মন্দিরের সেবাইত।

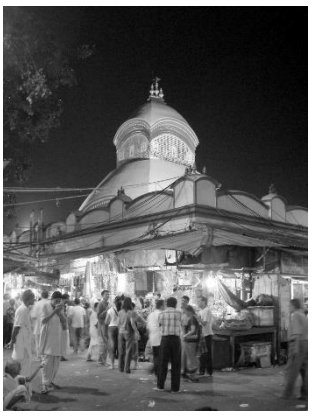

তথ্যসূত্রঃ

১. "বঙ্গীয় সাবর্ণ কথা-কালীক্ষেত্র কলিকাতা"-ভবানী রায় চৌধুরী

২. "কালীঘাটের পুরাতত্ব"- সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩. "৫১পীঠ"- হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

৪. "কালীরূপের তাৎপর্য"- প্রদীপ রায় চৌধুরী

৫. "অমৃততীর্থ কালীঘাট"- শৌভিক গুপ্ত

৬. "কলিকাতার সেকালের ও একালের"- হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

৭. "সম্বন্ধ নির্ণয়"-লালমোহন বিদ্যানিধি

৮. "প্রাচীন কলিকাতা"- শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

৯. "লক্ষ্মীকান্ত"- অতুলকৃষ্ণ রায়

১০. "পীঠমালা"-শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য

১১. "কালীঘাট-ইতিবৃত্ত"- উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১২. "পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র"- দীপ্তিময় রায়

১৩. "কলকাতা বিচিত্রা"- রাধারমণ রায়

১৪. "কালীক্ষেত্র দেবীপিকা"- সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

Kalighat Temple – old picture

SSPC's Social Responsibility in association with Patrasayer Welfare society

Arka Mukherjee

Patrasayer Welfare society is formed with the aim to serve humanity with the combined efforts from the people of society. We believe in ' Maximisation of a minimum resource we have ' . After starting our run in 2018, we have been working with the underprivileged people of our area , Patrasayer, a block of Bankura district with some disadvantages. We aim to reach people and help them and to follow our planning we host programs and operation time to time. Regularly we hold coaching in the tribal area free of cost for the tribal students who are mainly from a very poor background. Besides it, we organize science camps to fight our battle against superstitions and wrong rituals which hinder the true advancement of social life. We also provide books and offer special coaching for Secondary and higher secondary students. Along with those activities we try to help people with the materials which they need most such as rags in the time of winter or dresses. We are very fortunate to have Stockholm Sarbojoinin Puja Committee as our partner of welfare activities. We are also spirited when we find people so far from our land till so close to hearts being human is helping us to take initiative and this combination makes a smooth journey in doing welfare activities. This year in festive season we have able to help 35 people with new dresses including 22 women, 9 male, and 4 children. They are from a very poor background and perhaps without the assistance of Stockholm Sarbojoinin Puja Committee, we cannot provide them new dresses. They have tremendous joy when they hear that they are getting this dress because of Stockholm Sarbojonin Puja Committee which is in far away from their land but it is a speciality of humanity where people feel for people irrespective of distance or country. To them it is not just a dress, it is an acknowledgment of fellow citizenship from Patrasayer Welfare Society and Stockholm Sarbojonin Puja Committee, it is an assurance to stand by them to be with them . The smile on their faces says it all. They are eager to meet the wonderful people of Stockholm Sarbojoinin Puja Committee without whom perhaps this year they will spend puja with torn and ragged dresses. We are also very happy to have association made with Stockholm Sarbojonin Puja Committee and they are giving us the resource and energy to serve humanity as it has been our aim. We hope that our works to serve humanity to make our society better for underprivileged people with social and economical drawback in collaboration with Stockholm Sarbojonin Puja Committee will run and through activities and services for people who are in need, our bonding will be strong and jointly we shall try to do maximization of our efforts for the benefit and welfare of people . This is the start, the track is ready and we have to run with the baton of humanity –

Thanks, Stockholm Sarbojoinin Puja Committee .

Stockholm
INDIAN
GRILL
EST. 2016
শুভ
শারদীয়া

NGroceries
N Groceries
Enrich Your Life
www.ngroceries.com
Rice, Flour, Oil, Fresh Green Vegetables,
Fruits, General Groceries, Frozen Food
Home Delivery
0723337729
www.ngroceries.com
শারদ
শুভেচ্ছা

small world
Small World
Money Transfer
www.smallworldfs.com info.se@smallworldfs.com +46 101 013 160
শারদ
শুভেচ্ছা

MÄRSTA HÄLSOBUTIK
Nymärstatorg 7
19530 Märsta
শুভ শারদীয়া
One stop solution for all your
health problems
0859115450

REXTAN
ENTREPRENAD AB

AKTRADE HOUSE

AKTRADE HOUSE är ett grossistföretag som vänder sig till restauranger och butiker
www.aktradehouse.se

আমাদের তরফ থেকে SSPC কে জানাই
শারদীয়া শুভেচ্ছা

SPICE OF INDIA

SPICE OF INDIA -
INDISK RESTAURANG
PÅ ÖSTERMALM OCH
I VASASTAN

4.0

SPICE OF INDIA ÄR EN ÄKTA INDISK RESTAURANG MED INSLAG AV MATRÄTTER FRÅN HELA INDIEN.

TELEFON 08 - 10 23 33

Wishing you a Happy Durga Puja !

Indcen Resor

Wishing you a Happy Durga Puja